ഉറൂബ്

অস্‌কার ওয়াইল্ডের গল্প

অনুবাদ করেছেন

বুদ্ধদেব বসু





সিগ্‌নেট প্রেস : কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী
মিঃ ভিভিয়ান হল্যাণ্ডের
অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড কলিকাতা
—মুদ্রাকর—
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওআলিস স্ট্রিট কলিকাতা
ছবি এঁকেছেন
সূর্য রায়
অস্কার ওয়াইল্ডের ছবি
সত্যজিৎ রায়
—বাঁধিয়েছেন—
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট কলিকাতা

দাম দুটাকা চারআনা

সূচিপত্র



জন্ম : ১৬ই অক্টোবর ১৮৫৪। মৃত্যু : ৩০শে নভেম্বর ১৯০০

অস্‌কার ওয়াইল্ড্‌

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা নামজাদা ছিলেন, অস্‌কার ওয়াইল্ড তাঁদের একজন। গোল্ডস্মিথ, শেরিডান ও বনার্ড শ'র মতো ইনিও জাতিতে আইরিশ, এবং তাঁদেরই মতো কৌতুক-নাট্য রচনায় ওস্তাদ। অবশ্য ওয়াইল্ড শুধু নাটকই লেখেননি, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতাও লিখেছেন, তাছাড়া ছোটোদের জন্য কয়েকটি অপরূপ রূপকথাও এঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছিলো। সেই গল্প ক'টি বাংলায় তর্জমা ক'রে আজ তোমাদের উপহার দিচ্ছি—আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, এবং এও আশা করি যে বড়ো হ'য়ে তোমরা এই গল্পগুলি মূল ইংরেজিতেও পড়বে, কারণ এটা তো জানো যে তর্জমায় মূল রচনার সম্পূর্ণ রস কখনোই পাওয়া যায় না।

অস্‌কার ফিন্‌গাল ও' ফ্ল্যাহার্টি উইল্‌স্‌ ওয়াইল্ড ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে ডবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার ডাক্তার, আর তাঁর মা ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা সাহিত্যানুরাগিণী, নিজে একটু-আধটু কবিতাও লিখতেন। সাহিত্য বিষয়ে অস্‌কারের প্রথম শিক্ষা মা-র কাছেই। নিজের দেশে পড়াশুনো শেষ ক'রে অস্‌কার অক্সফোর্ডে পড়তে আসেন, এবং এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পর-পর দুটি

বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি অর্জন ক'রে চব্বিশ বছর বয়সে লণ্ডনে আসেন ইংরেজি সাহিত্যজগতে জয়ী হ'তে। এই নবীন প্রতিভার অভ্যর্থনার জন্য লণ্ডন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো, কারণ তাঁর খ্যাতি ছাত্রাবস্থাতেই অক্সফোর্ডের সীমানা ছাড়িয়ে লণ্ডনের সাহিত্যিক-মহলে এসে পৌঁছেছিলো। অক্সফোর্ডে তাঁর সুনাম ও দুর্নাম দুই-ই হয়েছিলো—সুনাম হ'লে কিছু দুর্নাম সঙ্গে-সঙ্গে হবেই। তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করবার শক্তি কারো ছিলো না, কারণ তিনি কলেজে ভরতি হ'য়েই কবিতা রচনার প্রতি-যোগিতায় 'নিউডিগেট প্রাইজ' পেয়েছিলেন, তার উপর কলেজের পড়াশুনোয় তাঁর ছিলো অসামান্য দখল। কিন্তু তাঁর হাবভাব চলাফেরা অনেকেরই পছন্দ হ'তো না। অক্সফোর্ডে তিনি থাকতেন নবাবের হালে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গুলজার আড্ডা জমাতেন, চুল রাখতেন লম্বা, কাপড়-চোপড় পরতেন অভিনব ছাঁদের—মোটের উপর লোকটি ছিলেন অতিমাত্রায় শৌখিন। এই কারণে অনেক ছেলেরই তিনি চক্ষুশূল ছিলেন। একবার একদল ষণ্ডামার্ক ছেলে তাঁকে রাস্তায় ধ'রে হাতে পায়ে বেঁধে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর টেনে তুলে ছেড়ে দিয়েছিলো। অস্‌কার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জামার হাতা থেকে ধুলো ঝেড়ে আস্তে বললেন, 'বাঃ, এখান থেকে দৃশ্যটি তো ভারি সুন্দর!' সেদিন সেই ষণ্ডা ছেলেরাই যে জব্দ হ'য়ে বাড়ি ফিরেছিলো তা অবশ্য না-বললেও চলে।

লণ্ডনে এসে অস্‌কার ওয়াইল্ড অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্পী ও সাহিত্যিক-মহলে পরিচিত হ'য়ে উঠলেন। রাজধানীর বিখ্যাত বাড়িগুলির দরজা একে-একে তাঁর কাছে খুলে যেতে লাগলো, এবং নানা পত্রিকায় রচনা প্রকাশ ক'রে তিনি কিছু-কিছু

উপার্জনও করতে লাগলেন। এই সময় থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে নব-নব কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন ক'রে চললেন—এই ষোলো বছর তাঁর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়। তাঁর রচনায় ছিলো বুদ্ধির দীপ্তি, বিদ্যার বৈভব, ভাষার অসাধারণ চাকচিক্য, তার উপর হাস্যরসে তাঁর ছিলো স্বাভাবিক দখল। এ-সব কারণে তাঁর ভক্তের সংখ্যা দিন-দিন বাড়তে লাগলো। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের দুটি থিয়েটরে তাঁর দুটি নাটক এক সঙ্গে চলছে, বাজারে অনেকগুলো বই কাটছে, আর বার্ষিক আয় ৮০০০ পাউণ্ডে এসে ঠেকেছে। এই তাঁর কৃতিত্ব ও খ্যাতির চরম।

ঠিক এর পরেই ওয়াইল্ডের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হ'লো। লর্ড কুইন্সবেরি নামে এক ঝগড়াটে বুড়ো ভদ্রলোক অন্যায়ভাবে তাঁর নামে এক মামলা করেন, সে-মামলায় ওয়াইল্ডের একেবারে সর্বনাশ হ'য়ে গেলো। অসংখ্য পাঠকের প্রিয়, ইওরোপের অনেক কবি শিল্পী মনীষীর বন্ধু অস্‌কার ওয়াইল্ডের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো, এবং দু'বছর ধ'রে সাধারণ কয়েদীরই মতো জেলখানার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হ'লো তাঁকে। বেরিয়ে এসেও তিনি আগের মতো মানুষ আর রইলেন না। বন্দী দশা থেকে বেরিয়ে এলো তাঁর শরীরটা মাত্র—তাঁর স্বাস্থ্য, উৎসাহ, আনন্দ সমস্তই যেন জেলখানা দু'বছরে নিঃশেষে শোষণ ক'রে নিয়েছিলো।

এর পরে তিনি আর তিন বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন, এবং এই তিন বছরে বলবার মতো একটি লাইনও আর রচনা করেননি। জীবনের শেষ দিনগুলি দারিদ্র্যে হতাশায় অপমানে অতি দুঃখের মধ্যে কেটেছিলো তাঁর। শরীরও দিন-দিনই ভেঙে পড়ছিলো,

নতুন শতাব্দী দেখে যাবার আশা তাঁর নিজের মনে ছিলো না। কিন্তু নতুন শতাব্দীর প্রথম বছরটির আরম্ভ তিনি দেখতে পেলেন, তবে তার শেষ আর দেখলেন না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ফ্রান্সের এক ছোটো শহরে তাঁর মৃত্যু হ'লো।

ওয়াইল্ডের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেকেই তাঁর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। দেখতে তিনি সুপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া চেহারায় বেশ একটা জমকালো ভাব ছিলো। তাঁর সাজসজ্জাও ছিলো জমকালো, মূল্যবান অলংকার ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন, ছেলে বয়সের অত্যন্ত শৌখিন ভাবটা কখনোই তিনি ছাড়তে পারেননি। কথা-বলায় ছিলো আশ্চর্য নিপুণতা, তাঁর মুখে উত্তর-প্রত্যুত্তর বিদ্যুতের মতো ঝলসাতো—শুনলে মনে হ'তো তাঁর কাছে ভালো ভালো কথার সংগ্রহ খাতায় লেখা আছে, রোজ বেরোবার আগে তারই কিছু-কিছু তিনি মুখস্থ ক'রে নেন। বাইরে থেকে মানুষটাকে বড্ড বেশি চালিয়াত মনে হ'তো, আসলে কিন্তু তাঁর স্বভাবটা ছিলো একদিকে সরল, সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল, অন্যদিকে যেমন ফুর্তিবাজ, তেমনি হাস্যরসিক। তাঁর বন্ধুরা যে সকলেই তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতো এতে অবাক হবার কিছু নেই।

সব মানুষই দোষে গুণে মেশা ; অস্কার ওয়াইল্ডের অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ছিলো, সত্যি তিনি একটু বেশিমাত্রায় শৌখিন ছিলেন। কোনো কথা শুনতে ভালো ব'লেই তিনি সেটা বলতেন, সে-কথা যদি কারো মনে আঘাত দেয় কি তার যদি ভালোরকম কোনো মানেও না হয়, সেজন্য তিনি পরোয়া করতেন না। লোককে আনন্দ দেবার চাইতে লোককে চমক লাগাতেই তিনি ভালোবাসতেন। এ-দোষ তাঁর বেশভূষা, কথোপকথন, আচার-

ব্যবহার থেকে তাঁর সাহিত্য রচনা পর্যন্ত সর্বত্রই পাওয়া যায়। অবশ্য এও বলবার আছে যে ইংরেজি সাহিত্যের সে-যুগের লেখকদের মধ্যে এমন খুব বেশি নেই যিনি এ-দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুখের বিষয়, অস্কার ওয়াইল্ডের রচনার মধ্যে ছোটোদের গল্প ক'টিতেই এই ভাব সবচেয়ে কম। এখানে তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয় সরল হৃদয়েরই পরিচয় তিনি দিয়েছেন। গল্পগুলিতে অ্যাণ্ডারসনের প্রভাব স্পষ্ট—তাই ব'লে ওয়াইল্ড অ্যাণ্ডারসনের অনুকরণ অবশ্য করেননি, ওয়াইল্ডের স্বকীয় প্রতিভায় প্রতিটি গল্পের প্রতিটি কথা উজ্জ্বল। নানা রঙে রঙিন, খামখেয়ালি, কোমল-মধুর এই গল্পগুলি ইংরেজিতে শিশু-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, এ-সম্পদ আমাদের মাতৃভাষায় তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমিও আজ আনন্দিত।

এই অনুবাদগুলির মধ্যে দুটি "মৌচাকে" ও একটি "রংমশালে" প্রকাশিত হয়েছিলো। এটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করা এখন সম্ভব হ'তো না, যদি না আমার অনুজপ্রতিম দিলীপকুমার গুপ্ত এ-বিষয়ে উৎসাহী হতেন। এ-সুযোগে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১লা আষাঢ়, ১৩৫১

বুদ্ধদেব বসু



রাজপুত্রের বিয়ে, চারদিকে তাই হৈ-চৈ, ধুমধাম।

কনের দেশ রুশ-রাজ্যে, সেখান থেকে এসে পৌঁছতে তাঁর একটি বছর লাগলো। ছ'টা বড়ো-বড়ো হরিণে-টানা গাড়িতে ফিন-নগর থেকে তিনি রওনা হয়েছিলেন, এতদিনে এসে পৌঁছলেন। গাড়িটি দেখতে ঠিক যেন মস্ত সোনালী রাজহাঁস, দুই পাখা তার মেলে দেয়া, আর তার মাঝখানে রাজকন্যা ব'সে। তাঁর পা পর্যন্ত ছুঁয়েছে লম্বা রুপোলী পেশোয়াজ, মাথায় রুপোর সুতো দিয়ে বোনা ছোট্ট টুপি, আর মুখটি তাঁর তুষারের মতোই ম্লান—সারা জীবন তিনি তুষার-প্রাসাদেই কাটিয়েছেন কিনা। তাঁর মুখের চামড়া এতই পাতলা আর রং এতই পরিষ্কার যে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে গাড়িটি চ'ড়ে চ'লে গেলেন দু'দিকের লোক হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো 'ঠিক যেন শাদা গোলাপটি,' ব'লে তারা বারান্দা থেকে তাঁর গায়ে ফুল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

রাজপ্রাসাদের সিংহদরজায় তাঁকে হাত ধ'রে নামালেন স্বয়ং রাজপুত্র। রাজপুত্রের বেগনি রঙের চোখ দুটি স্বপ্নে টলোমলো, মাথার চুল পাতলা সোনার মতো। তিনি হাঁটু ভেঙে ব'সে রাজকন্যার ছোট্ট হাতটিতে চুমু খেলেন।

রাজপুত্র বললেন, 'তোমার ছবি যে সুন্দর তা দেখেছিলাম, কিন্তু তুমি তোমার ছবির চেয়েও সুন্দর।'

শুনে রাজকন্যার শাদা গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠলো।

একজন অমাত্য বললে, 'উনি আগে ছিলেন শাদা গোলাপ, এখন হ'য়ে উঠলেন লাল গোলাপ।'

কথাটা শুনে রাজসভায় সকলেই খুশি।

তারপর তিন দিন ধ'রে সকলেই চারদিকে ব'লে বেড়াতে



লাগলো, 'শাদা গোলাপ, লাল গোলাপ ; লাল গোলাপ, শাদ গোলাপ' ; আর রাজার হুকুম হ'লো ঐ অমাত্যের মাইনে ডবল ক'রে দেয়া হোক। অমাত্যটি অবশ্য কোনো মাইনেই পেতো না, তাই এতে তার বিশেষ কোনো সুবিধে হ'লো না ; কিন্তু তাই ব'লে সম্মানটা তো কম নয়। এমনকি সাপ্তাহিক 'সভাপ্রভাকরে,' খবরটা বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপা পর্যন্ত হ'লো।

ঐ দিন তিনটি কেটে যেতেই বিয়ে হ'য়ে গেলো। সে কী জমকালো ব্যাপার! বর-কনে হাতে হাত ধ'রে যে-চাঁদোয়ার তলে হেঁটে বেড়ালেন সেটা বেগনি মখমলের তৈরি আর তাতে জরির মতো ছোটো-ছোটো মুক্তো বসানো। তারপর রাজ-প্রাসাদে ভোজের পালা, সে কী যে-সে ভোজ, শেষ হতে পুরো পাঁচটি ঘণ্টা লাগলো। বর-কনে বসলেন নাটমন্দিরে, যাতে সবাই তাঁদের দেখতে পায়, তারপর স্বচ্ছ স্ফটিকের গেলাশে তাঁদের পানীয় এলো। গেলাশটিও যেমন-তেমন নয়, কারণ তা থেকে খাওয়া চলবে শুধু তাদেরই, সত্যি-সত্যি যারা ভালোবাসে ; আর ভালোবাসা যার কপট তার ঠোঁট ছোঁয়ামাত্র সেটি মেঘলা হ'য়ে যাবে, রং হবে ছাইয়ের মতো।

'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে ভালোবাসা খুব গভীর,' সেই

অমাত্যটি আবার বললে। 'আর স্ফটিকেরই মতো নির্মল।' এ-কথা শুনে রাজা আরো একবার তার মাইনে ডবল ক'রে দিলেন।

'কত বড়ো সম্মান! কত বড়ো সম্মান!' সভাসদরা বলাবলি করতে লাগলো। ভোজের পরে নাচ। বর-কনে একসঙ্গে গোলাপনৃত্য নাচবেন, আর রাজা বাজাবেন বাঁশি। রাজামশাই আসলে বাজান খুব খারাপ, কিন্তু তিনি রাজা ব'লে তাঁকে সে কথা বলতেই কেউ সাহস পায় না। তিনি দুটো গৎই মোটে জানতেন, আর তাও কখন কোনটা বাজাচ্ছেন তা তাঁর প্রায়ই গুলিয়ে যেতো। তা রাজার পক্ষে ও একই কথা, কারণ তিনি যখন যা করতেন, সবাই সঙ্গে-সঙ্গে চারদিক থেকে 'আহা! আহা!' ক'রে উঠতো।

উৎসব শেষ হবে বাজি পোড়ানো দিয়ে। ঠিক মাঝরাতে বাজির খেলা শুরু হবার কথা। রাজকন্যা আগে কখনো বাজি ছোঁড়া ছাখেননি, তাই রাজা রাজ-বাজিকরকে ব'লে রেখেছিলেন যে বিয়ের সময় তার উপস্থিত থাকা চাই।

একদিন সকালে বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে রাজকন্যা রাজপুত্রকে জিগগেস করলেন, 'বাজি কেমন জিনিস?'

রাজামশাই ব'লে উঠলেন, 'ঠিক মেরুসূর্যের মতো।' তাঁর একটা অভ্যেস ছিলো কেউ অন্য কারো কাছে কোনো কথা জিগগেস করলে তিনি নিজেই তার জবাব দিয়ে দিতেন। 'তবে তার চেয়ে ঢের বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। আমার তো আকাশের তারার চেয়ে বাজিই পছন্দ—কখন জ্বলবে কখন নিববে তা আগে থেকেই জানা থাকে কিনা। বলতে গেলে আমার বাঁশি বাজানোর মতোই বাজি পোড়ানো তোমার ভালো লাগবে। রোসো তোমাকে দেখাতেই হচ্ছে।'

দেখতে-দেখতে রাজার বাগানের এক ধারে একটা মাচা তৈরি করা হ'লো, আর রাজ-বাজিকর তার উপর রাজ্যের যত বাজি এনে জড়ো করলেন। যেই না তাদের গুছিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রাখা অমনি বাজিগুলো শুরু করলে গল্পগুজব।

ছোট্ট একটা ছুঁচোবাজি বললে, 'যাই বলো ভাই, পৃথিবীটা সত্যি বড়ো সুন্দর জায়গা। ছাখো না ঐ আকন্দ ফুলগুলো। এত সুন্দর, দেখে মনে হয় সত্যিকার চটপটি। এত দেশ ভ্রমণ ক'রে আমি ভালোই করেছি। জানো তো, ভ্রমণে মনের আশ্চর্য উন্নতি হয়, সব কুসংস্কার কেটে যায়।'

বড়ো একটা আতসবাজি ব'লে উঠলো, 'ওরে বোকা ছুঁচো, তুই বুঝি ভেবেছিস রাজার এই বাগানটাই সমস্ত পৃথিবী! পৃথিবীটা যে মস্ত বড়ো জায়গা, সমস্তটা ভালো ক'রে দেখতে তি-ন-দি-ন লাগবে।'

'যে যে-জায়গা ভালোবাসে সেটাই তার পৃথিবী,' ব'লে উঠলেন তুবড়ি-বিবি। প্রথম জীবনে একটি মাটির ভাঁড়ের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা হয়েছিলো, আর নিজের ভাঙা হৃদয় নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা ছিলো না। 'ভালোবাসার ফ্যাশন আজকাল আর নেই, কবিরা তার জাত মেরেছে। ওরা এ নিয়ে এত বেশি লেখালেখি করতে লাগলো যে কেউ আর ওদের কথা বিশ্বাস করলে না—তা না-করবারই কথা। সত্যিকার ভালোবাসা চুপ ক'রে দুঃখভোগ করে—কথা কয় না। মনে পড়ে আমার একবার —কিন্তু সে-কথা আর ব'লে লাভ কী? রোমান্স ব'লে এখন আর কিছু নেই, সে অতীত যুগের—সে অতীত।'

'বাজে কথা!' বললে আতসবাজি। 'রোমান্স কি কখনো মরে! ও

যে চাঁদের মতো, ওর আয়ু চিরকালের। এই ধরো না, আমাদের রাজপুত্র আর রাজকন্যা, তাঁদের মধ্যে ভালোবাসা তো খুবই গভীর। আমার সঙ্গে একই দেরাজে একটা তারাবাজি ছিলো, তার কাছে এ-সব কথা আমি শুনেছি। রাজসভার সব টাটকা খবর তার জানা।'

কিন্তু তুবড়ি-বিবি মাথা নেড়ে কেবলই বলতে লাগলেন, 'রোমান্স গেছে ম'রে, রোমান্স গেছে ম'রে, রোমান্স গেছে ম'রে।' অনেকের ধারণা, কোনো একটা কথা বার-বার করে বললেই শেষ পর্যন্ত সেটা সত্যি হ'য়ে যায়, তুবড়ি-বিবি তাদেরই একজন।

হঠাৎ একটা খনখনে শুকনো কাশির আওয়াজ শুনে তারা সবাই ফিরে তাকালো।

আওয়াজটা করছে একটা হাউই।

দেখতে লম্বা, মুখের ভাবটা বড্ড দেমাকি। একটা লম্বা কাঠির সঙ্গে সে বাঁধা। কোনো কথা বলবার আগে সে সর্বদাই একটু কেশে নেয় যাতে সকলে তার দিকে মন দেয়।

হাউইটা আবার কাশির শব্দ করলে।

তখন তার কথা শোনবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলো— শুধু তুবড়ি-বিবি তখনও মাথা নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন, 'রোমান্স গেছে ম'রে।'

একটা চটপটি ব'লে উঠলো, 'অর্ডার! অর্ডার!' সে একটু রাজনৈতিক গোছের জীব, কর্পোরেশনের ভোটের সময় সর্বদাই গলাবাজি করেছে, তাই সভাস্থলে কখন কী কথা বলতে হয় তা সবই জানা আছে।

'গেছে, ম'রে গেছে,' চুপি-চুপি আরো একবার এ-কথা ব'লে তুবড়ি-বিবি ঘুমিয়ে পড়লেন।

যেই সবাই চুপ হ'লো, শ্রীযুক্ত হাউই আরো একবার কেশে তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু, উচ্চারণ পরিষ্কার, যেন তাঁর জীবনস্মৃতি মুখে-মুখে ব'লে যাচ্ছেন, আর যার কাছে বলছেন তাকে যেন ভালো ক'রে দেখতেই পাচ্ছেন না। মোটের উপর তাঁর হাব-ভাব দেখে তাঁকে একটা বিশেষ-কেউ মনে হয়।

হাউই বললে, 'রাজপুত্রের ভাগ্য বটে! আমাকে যখন ছোঁড়া হবে, ঠিক সেই সময়ই তাঁর বিয়ে হ'লো! যেন আগে থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক করা ছিলো! রাজপুত্রদের ভাগ্যই আলাদা!'

ছুঁচোবাজি বললে, 'সে কী কথা! আমি তো ভেবেছিলুম উল্টো ব্যাপার, রাজপুত্রের বিয়ের উপলক্ষ্যেই বুঝি আমাদের ছোঁড়া হবে!' হাউই বললে, 'তোমাদের বেলায় তা হ'তে পারে—হ'তে পারে কেন, তোমাদের বেলায় নিশ্চয়ই তা-ই। কিন্তু আমি—আমার কথা আলাদা। আমি হলেম অতি আশ্চর্য হাউই। আমার মা-বাবা—তাঁরাও কম নন। আমার মা ছিলেন সে-যুগের সব চেয়ে বিখ্যাত তুবড়ি—তাঁর নাচের তুলনা ছিলো না। সেই যেবার বড়ো শহরে তাঁর নাচ দেখানো হ'লো, ঊনিশটি বার তিনি লাট্টুর মতো বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরলেন, তবে নিবে গেলেন। আর প্রত্যেকবার সাতটি ক'রে লাল রঙের তারা ছুঁড়ে দিলেন আকাশে—ভাবতে পারো! তাঁর কোমরের বেড় ছিলো সাড়ে তিন ফুট আর সবচেয়ে ভালো বারুদ দিয়ে তাঁকে বানানো হয়েছিলো। আর আমার বাবা ছিলেন আমারই মতো হাউই, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ফরাসী। তিনি এত উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন যে সবাই ভাবলে তিনি বুঝি আর নামবেনই না। কিন্তু লোকের উপর দয়া ক'রে তিনি নেমেও এসেছিলেন—দেখে মনে হয়েছিলো যেন সোনালী বৃষ্টি হচ্ছে। খবরের কাগজে কত সুখ্যাতি তাঁর

বেরিয়েছিলো তোমরা তার কী জানবে। 'সভাপ্রভাকর' তো ব'লেই বসলো যে ইন্দ্রজালিক শিল্পের তিনিই হচ্ছেন চরম নিদর্শন।'

'ঐন্দ্রজালিক, ঐন্দ্রজালিক,' বললে রংমশাল। 'কথাটা ঐন্দ্র-জালিক—আমার ক্যানস্তারার উপর লেখা আছে।'

'তা হোক, আমি ওকে ইন্দ্রজালিকই বলি।' হাউই এমন তীব্রস্বরে কথাটা বললে যে মশাল বেচারা একেবারে হিমশিম খেয়ে গেলো। সে তক্ষুনি ছোটো-ছোটো ছুঁচোবাজিগুলোর মধ্যে ভয়ংকর চোটপাট ক'রে বেড়াতে লাগলো—তাতে বোঝা গেলো যে হাউইর কাছে ধমক খেলেও সে-ও এক জন কেউ-কেটা বটে।

হাউই বলতে লাগলো, 'আমি বলছিলুম—আমি বলছিলুম—কী বলছিলুম আমি ?'

তারাবাজি বললে, 'তুমি নিজের কথা বলছিলে।'

'ও, হ্যাঁ, তা-ই তো ; আমি কী-যেন একটা ভারি মজার কথা বলছিলুম, হঠাৎ ঐ অভদ্র লোকটা এসে বাধা দিলে। অভদ্রতা, যে-কোনো রকম অভদ্রতা, আমার অসহ্য। আমার মনটা—কী বলে গিয়ে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিনা। আমার মতো সূক্ষ্ম মন জগতে আর কারুরই আছে কিনা সে-বিষয় রীতিমতো সন্দেহ হয় আমার।

চটপটি জিগগেস করলে তারাবাজিকে, 'সূক্ষ্ম মন জিনিসটা কী ?'

তারাবাজি ফিসফিস করে বললে, 'সূক্ষ্ম মন তারই যে নিজের পায়ে ফোড়া হয়েছে ব'লে, সর্বদা অন্যের পা মাড়িয়ে চলে।'

শুনে চটপটি হাসতে-হাসতে ফেটে যায় আর কি।

হাউই গম্ভীর গলায় বললে, 'কী হে ছোকরা, অত হাসছো কেন ? আমি তো হাসছি না।'

'মনে ফুর্তি হয়েছে, তাই হাসছি,' বললে চটপটি।

হাউই চ'টে উঠে বললে, 'তুমি তো ভারি স্বার্থপর দেখছি। খামকা ফুর্তি করবার কোনো অধিকার তোমার নেই তা জানো ? তোমার উচিত অন্যের কথা ভাবা। সত্যি বলতে, আমার কথা ভাবা উচিত। আমি তো সব সময় নিজের কথাই ভাবি ; আর আমি আশা করি যে অন্য সকলেও তা-ই করবে। একেই তো বলে সহানুভূতি। সহানুভূতি একটি মহৎ গুণ, আর ও-গুণ আমার খুব বেশি মাত্রাতেই আছে। এই ধরো না, আজ যদি আমার ভালো-মন্দ কিছু হয়, সকলের পক্ষেই কত বড়ো দুর্ঘটনা সেটা! রাজপুত্র রাজকন্যা আর কি কখনো সুখী হতে পারবেন ? তাঁদের সমস্ত বিবাহিত জীবনই নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর রাজামশাই—আমি জানি তিনি এ-ধাক্কা সামলে উঠতে পারবেন না। সত্যি, আমার মর্যাদা যে কতখানি তা যখন ভাবি আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়ে।'

তারাবাজি বলে উঠলো, 'অন্যকে কিছু আনন্দ যদি দিতে চাও তাহ'লে নিজেকে শুকনো রাখাই তোমার কর্তব্য।'

'নিশ্চয়ই,' রংমশাল বললে (এতক্ষণে তার মন অনেকটা ভালো হ'য়ে গিয়েছিলো) 'এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা।'

হাউই বললে, 'সাধারণ বুদ্ধি! তোমরা ভুলে যাচ্ছো যে আমি অসাধারণ, আমি অতি আশ্চর্য। আরে সাধারণ বুদ্ধি তো যে-কোনো লোকেরই থাকে, যদিও কল্পনাশক্তি থাকে না। আমার আছে কল্পনাশক্তি, তাই কোনো জিনিস আসলে ঠিক যে-রকম, সে-রকম ক'রে আমি কখনোই ভাবি না, সব সময় অন্যরকম ভাবি। তোমরা বলছো যে আমার শুকনো থাকা উচিত, তার মানে এই যে আমার আবেগপ্রবণ প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমাদের কারুরই কোনো ধারণা নেই। তা যাকগে, তোমরা কী ভাবো না ভাবো তাতে

আমার এসে যায় না কিছুই। আমি নিশ্চিত জানি যে অন্য সকলেই আমার চাইতে অনেক, অনেক নিচু স্তরের জীব, এই ধারণা দিন-দিনই আমার মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল হচ্ছে আর এরই জোরে আমি টিকে আছি। তোমাদের তো হৃদয় ব'লে কিছু নেই। এখানে তোমরা দিব্যি হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করছো, এদিকে রাজপুত্র-রাজকন্যার যে এইমাত্র বিয়ে হ'লো সে খেয়ালই নেই তোমাদের!'

গোলগাল বেলুনটি এতক্ষণে বললে, 'সে কী কথা! রাজপুত্রের বিয়ে হয়েছে ব'লেই তো আমরা ফুর্তি করছি। এ তো ফুর্তি করবারই সময়। আমি তো ভাবছি আকাশে ভেসে গিয়ে তারাদের কাছে এ-কথা বলবো। তাদের কাছে রাজকন্যার রূপের বর্ণনা যখন করবো তখন দেখো তাদের কেমন চোখ মিটমিট করে।'

ছী-ছি, জীবন সম্বন্ধে কী তুচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি!' বললে হাউই। 'কিন্তু তোমাদের কাছে এর বেশি আর কী আশা করা যায়! তোমাদের ভিতরে তো সার পদার্থ কিছু নেই; তোমরা সব ফাঁকা আর ফাঁপা। ধরো না, রাজপুত্র-রাজকন্যা কোনো-এক দেশে বাস করতে গেলেন। সেখানে আছে মস্ত এক নদী। তারপর ওদের একটি ছেলে হ'লো—একটি মাত্র ছেলে—ঠিক বাপের মতো সোনালী চুল আর বেগনি রঙের চোখ তার। একদিন হয়তো আয়ার সঙ্গে বেড়াতে গেলো, তারপর আয়া ঘুমিয়ে পড়লো একটা শিমুল গাছের ছায়ায়, এদিকে খোকাবাবু ঝপাস ক'রে প'ড়ে গেলো মস্ত নদীর জলে, প'ড়ে ডুবে গেলো। উঃ কী সাংঘাতিক! কী ভীষণ দুর্ঘটনা! আহা—একমাত্র ছেলে জলে ডুবে ম'রে গেলো, এ কি সহজ কথা! কী ভয়ানক! কী ভয়ানক কাণ্ড! আমি তো এ-ধাক্কা সামলে উঠতে পারবো না।

তারাবাজি বললে, 'কিন্তু সত্যি-সত্যি তো আর ওদের একমাত্র

ছেলে মারা যায়নি। সত্যি বলতে, কোনো দুর্ঘটনাই তো ঘটেনি।'

হাউই জবাব দিলে, 'ঘটেছে তা তো আমি বলিনি, তবে ঘটতে তো পারে। যদি সত্যি-সত্যি ওদের একমাত্র ছেলে মারা যায় তাহ'লে তা নিয়ে তো আর বলবার কিছু থাকবে না। যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এ কথা যারা মানে না তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। কিন্তু যখন আমি ভাবি যে তাঁদের একমাত্র ছেলে মারা যেতে পারে, তখন আমার মন এত খারাপ হ'য়ে যায় যে বলবার নয়।'

রংমশাল বললে, 'ও-সব বাজে বিষয় নিয়ে মন খারাপ করবার সময় আমার নেই।'

'তুমি তো ভারি অভদ্র হে!' হাউই ব'লে উঠলো। 'রাজ-পুত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুতা যে কতখানি তা তো তুমি বুঝবে না।'

'বন্ধুতা!' তারাবাজি খেঁকিয়ে উঠলো। 'তুমি তো তাঁকে চেনোও না।'

হাউই জবাব দিলে, 'আমি তো বলিনি যে তাঁকে আমি চিনি। চিনলে হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুতাই হ'তো না। বন্ধুরা অচেনা থাকাই ভালো, তাদের চিনতে গেলেই বিপদ।'

বেলুন বললে, 'আর বাজে না ব'কে শুকনো থাকতে পারো কিনা সে-চেষ্টা করো। সেটাই আসল কথা।'

'তোমার পক্ষে আসল কথা হ'তে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছে হ'লেই আমি কাঁদবো,' ব'লে হাউই সত্যি-সত্যি কাঁদতে আরম্ভ করলো। তার চোখের জল বৃষ্টির ফোঁটার মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে দুটো গুবরে পোকাকে প্রায় ডুবিয়ে দেয় আর কি। পোকা দুটো

বাসা বাঁধবার জন্য একটু শুকনো জায়গা খুঁজছিলো—বেগতিক দেখে তারা দিলে দৌড়।

তুবড়ি-বিবি বললেন, 'লোকটা দেখছি সত্যি রোমান্টিক ধাঁচের, কাঁদবার কোনো কারণ না-থাকলেও কাঁদতে পারে।' ব'লে তিনি গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই মাটির ভাঁড়ের কথা ভাবতে লাগলেন।

এদিকে তারাবাজি আর রংমশাল অত্যন্ত চ'টে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'লোকটা একটা জোচ্চোর! জোচ্চোর! জোচ্চোর!' তাদের সাংসারিক বুদ্ধি ছিলো প্রখর, তাই যখনই কোনো জিনিস পছন্দ হ'তো না তারই মধ্যে জোচ্চুরি দেখতে পেতো।

তারপর আশ্চর্য একটি রুপোর ঢালের মতো চাঁদ উঠলো, তারা ফুটলো, আর প্রাসাদের দিক থেকে এলো গান-বাজনার শব্দ।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা নাচ আরম্ভ করলেন। তাঁরা এত সুন্দর নাচলেন যে লম্বা শাদা রজনীগন্ধা জানালায় উঁকি দিয়ে তাঁদের দেখতে লাগলো আর কেয়ার গুচ্ছ মাথা নাড়তে লাগলো তালে-তালে।

দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, তারপর বাজলো বারোটা। মাঝ-রাতের ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সবাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, আর রাজা ডেকে পাঠালেন তাঁর সভার ঐন্দ্রজালিককে।

'এখন বাজি খেলা আরম্ভ হোক,' রাজা হুকুম দিলেন।

ঐন্দ্রজালিক লম্বা কুর্নিশ ক'রে বাগানে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছ'জন চাকর, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে জ্বলন্ত মশাল।

সত্যি বড়ো সুন্দর হয়েছিলো দেখতে।

ফোঁস-ফোঁস-ফোঁস-ফোঁস্স্স্! ছুটলেন তুবড়ি-বিবি, নেচে-নেচে জ্ব'লে-জ্ব'লে ফুরিয়ে গেলেন। ভোঁ-ভোঁ-ভোঁম্! ফুটলো তারাবাজি। আতসবাজিরা পাগলের মতো নেচে বেড়াতে লাগলো, এদিকে রংমশালের আলোয় সব উঠলো লাল হয়ে। 'চললুম,' ব'লে বেলুন উড়ে চ'লে গেলো, ঝরিয়ে গেলো ছোটো-ছোটো নীল ফুলকি। চটপটিগুলোর মহা ফুর্তি—তারা কেবলই প্যাঁক প্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক করছে। বাজিগুলো সবই খুব চমৎকার জ্বললো, জ্বললো না শুধু আশ্চর্য হাউই। কেঁদে-কেঁদে সে এমন স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে গিয়েছিলো যে তার গায়ে আগুনই ধরলো না। তার ভিতরে সবচেয়ে সাচ্চা জিনিস হ'লো বারুদ আর সেই বারুদই গিয়েছিলো ভিজে। তার যত সব গরিব আত্মীয়, যাদের সঙ্গে সে কখনো কথাও বলেনি, তারা সবাই আগুনের মঞ্জরী ফুটিয়ে আশ্চর্য ফুলের মতো জ্ব'লে উঠলো। রাজসভার সবাই বার-বার বলতে লাগলো—বাঃ, বাঃ! আর ছোটো রাজকন্যাটির খুশি তো আর ধরে না।

হাউই মনে-মনে বললে, 'আমাকে বোধহয় বিশেষ-কোনো উপলক্ষ্যের জন্য রাখা হয়েছে।' আরো গম্ভীর, আরো দাম্ভিক মুখ ক'রে সে সেই বিশেষ উপলক্ষ্যের অপেক্ষা করতে লাগলো। পরের দিন লোকজন এলো বাগান পরিষ্কার করতে। 'নিশ্চয়ই রাজসভা থেকে পারিষদবর্গ আমার কাছে এসেছে,' বললে হাউই। 'আমার এখন কর্তব্য যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করা।' ব'লে সে তার নাকটি খুব উঁচুতে তুলে ভীষণ কটমট মুখ ক'রে তাকালো, যেন ভয়ানক জরুরি কোনো কথা ভাবছে। কিন্তু

ওরা কেউ তাকে লক্ষ্যই করলে না, কাজকর্ম শেষ ক'রে প্রায় চ'লেই যাচ্ছিলো, হঠাৎ একজন বললে, 'আরে এটা কী প'ড়ে আছে এখানে ?'

আর একজন বললে, 'কালকের সেই হাউইটা। বাজে হাউই,' ব'লে সে তাকে তুলে দেয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে খালের মধ্যে ফেলে দিলো।

হাউই পড়তে-পড়তে ভাবতে লাগলো, 'বাজে হাউই ? **বাজে** হাউই ? অসম্ভব! **রাজার** হাউই—লোকটা নিশ্চয়ই তা-ই বলেছে, রাজামশাই নিজে দেখবার জন্য আমাকে রেখে দিয়েছেন। **বাজে** আর **রাজার** শুনতে প্রায় একরকমই—আর কাজেও ওরা প্রায়ই এক।'

ভাবতে-ভাবতে সে ঝুপ ক'রে এসে পড়লো খালের জলে।

'জায়গাটা বিশেষ সুবিধের নয় দেখছি,' সে বললে। 'তা নিশ্চয়ই এটা বিশেষ-কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গা। রাজামশাই নিজে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য ভালো করবার জন্য। আর সত্যি, আমার শরীরটাও ভালো নেই—বিশ্রাম দরকার।'

ছোট্ট একটা ব্যাং, চোখ তার মুক্তোর মতো চকচকে, গায়ের চামড়া ফুটকি-তোলা সবুজ, সাঁতরে তার কাছে এলো।

ব্যাং বললে, 'তুমি নতুন এসেছো দেখছি। যাই বলো, কাদার মতো কিছু নেই। যদি বৃষ্টি হয় আর কোনো খালে বিলে থাকতে পাই, তার চেয়ে সুখ আর কী হ'তে পারে! বিকেলের দিকে বৃষ্টি হবে ব'লে কি মনে হচ্ছে ? আমি তো হবে ব'লেই আশা করছি, কিন্তু আকাশ যে একদম নীল, এক ফোঁটা মেঘ নেই। কী বিশ্রী!'

হাউই খক-খক ক'রে কেশে উঠলো।

'বাঃ, তোমার গলার আওয়াজটি তো বেশ,' বললে ব্যাং। 'ঠিক আমাদের ঘ্যানোর-ঘ্যানোরের মতো, আর ও-রকম সুরেলা শব্দ জগতে আর তো নেই। আমাদের ব্যাং-সমিতির আসর বসবে সন্ধেবেলায়, শুনতে যেয়ো। ঐ বুড়োর বাড়িটার পাশেই একটা এঁদো পুকুর আছে, সেখানে আমাদের আসর বসে। চাঁদ উঠলেই আমরা আরম্ভ করি। সে-আওয়াজ এতই মধুর যে কেউ ঘুমোতে পারে না, জেগে ব'সে শোনে। এই তো কালই বুড়ো তার বৌকে বলছিলো যে আমাদের জন্য সারারাত তার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। লোকে আমাদের গান এত ভালোবাসে সে-কথা ভাবতেও ভালো লাগে।'

হাউই চ'টে উঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তক্ষুনি আবার তার কাশি এলো, খক্-খক্-খক্ ছাড়া গলা দিয়ে কিছুই বেরুলো না। সে যে এতক্ষণে একটা কথাও বলতে পারছে না সে-জন্য বড্ড রাগ হ'লো তার।

ব্যাং আবার বললে, 'সত্যি ভাই, তোমার গলাটি ভারি মিষ্টি। এসো কিন্তু ঐ এঁদো পুকুরে। এখন যাই, দেখি মেয়েরা কোথায় গেলো। আমার ছ'টি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—সব সময়ে ভয়ে-ভয়ে থাকি পাছে বোয়াল মাছের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়। ওটা একটা রাক্ষস, ওদের খেয়ে ফেলতে ওর কিছুমাত্র দ্বিধা হবে না। আচ্ছা চলি, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড়ো খুশি হলাম।'

'আলাপ মানে?' ব'লে উঠলো হাউই। 'সারাক্ষণ তো তুমিই কথা বললে। একে আলাপ বলে না।'

'আহা, একজন শ্রোতাও তো চাই। যা বলবার তা আমিই বলবো, এই আমার ইচ্ছে। আমি বক্তা, তুমি শ্রোতা, এব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো নয় কি? তাতে তর্কাতর্কি হয় না, সময় বাঁচে।'

হাউই বললে, 'কিন্তু আমি তো তর্ক করতেই ভালোবাসি।'

ব্যাং বললে, 'রক্ষে করো! তর্ক যারা করে তারা নিতান্তই ইতর লোক। ভদ্রসমাজে সকলেরই মতামত ঠিক একরকম। আচ্ছা, এবার চলি, ঐ দূরে আমার মেয়েদের দেখা যাচ্ছে,' ব'লে ব্যাং সাঁতরে চলে গেলো।

হাউই বললে, 'তুমি লোকটা তো বড্ড চাষাড়ে দেখছি। তোমার কথা শুনে আমার মাথা ধ'রে গেলো। যারা কেবল নিজেদের বিষয়ে কথা বলে তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। আমি চাই নিজের বিষয়ে কথা বলতে, অথচ তুমি আমাকে হাঁ পর্যন্ত করতে দিলে না। একেই বলে স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা অতিশয় ঘৃণ্য দোষ, বিশেষ ক'রে আমার মতো সহানুভূতিশীল প্রকৃতির পক্ষে তা একেবারেই অসহ্য। সত্যি বলতে, আমাকে দেখে তোমার শেখা উচিত, কারণ আমার চেয়ে ভালো উদাহরণ তুমি আর পাবে না। যা শেখবার এই বেলা চটপট শিখে নাও, কারণ আমাকে এক্ষুনি আবার রাজ-সভায় ফিরে যেতে হবে। রাজসভায় আমার অসীম প্রতিপত্তি—জানো তো, কাল যে রাজপুত্র রাজ-কন্যার বিয়ে হ'লো, সে আমারই সম্মানে। তা তুমি নিরেট বাঙাল—এ-সব কথা জানবেই বা কোত্থেকে!'

একটা গঙ্গাফড়িং এতক্ষণ একটা কচুরিপানার ফুলের উপর চুপ ক'রে ব'সেছিলো, সে এইবার বললে, 'ওর সঙ্গে কথা ব'লে লাভ নেই। কিচ্ছু লাভ নাই। ও অনেক আগেই চ'লে গেছে।' হাউই জবাব দিলে, 'তাতে ওরই লোকশান, আমার নয়। ও শুনছে না ব'লেই যে আমি কথা বন্ধ করবো এমন লোক আমি নই। নিজের কথা শুনতে আমার নিজেরই ভালো লাগে। এটা আমার জীবনের একটি প্রধান আনন্দ। আমি অনেক সময় নিজে-নিজে অনেকক্ষণ

ধ'রে কথা বলি, আর আমার কথাবার্তা এতই চতুর যে অনেক সময় আমি নিজেও তার এক বর্ণও বুঝি না।'

'তাহ'লে তোমার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হওয়া উচিত,' ব'লে গঙ্গাফড়িং একজোড়া চিকচিকে পাতলা পাখা উড়িয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলো।

হাউই বললে, 'লোকটা কী বোকা—এখান থেকে চ'লে গেলো। মনকে উন্নত করবার এমন সুযোগ ও হেলায় হারালো! যাকগে, আমার এতে কিছুই এসে যায় না। আমার মতো প্রতিভাবানের কোনো-না-কোনোদিন সমাদর হবেই' বলতে-বলতে সে কাদার মধ্যে আরো একটু ডুবে গেলো।

খানিক পরে একটা মস্ত শাদা হাঁস সাঁতরে তার দিকে এলো। চ্যাপটা হলদে তার পা, খুব বেশি দুলে-দুলে হাঁটে ব'লে তার সমাজে মস্ত সুন্দরী ব'লে তার নাম।

'প্যাঁক-প্যাঁক, প্যাঁক-প্যাঁক,' সে কাছে এসে বললে। "কী অদ্ভুত আকৃতি তোমার! ঐ রকমই জন্মেছিলে, না কি কোনো দুর্ঘটনার ফল এটা?'

হাউই জবাব দিলে, 'তুমি যে সারাজীবন পাড়াগাঁয়ে কাটিয়েছো তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নয়তো আমি যে কে তা তুমি জানতে। যা-ই হোক, তোমার অজ্ঞতা আমি ক্ষমা করলুম। আমি নিজে অসাধারণ ব'লেই অন্যেরাও অসাধারণ হবে এতটা আশা করা সংগত নয়। তুমি শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে আমি আকাশে উঠে গিয়ে তারপর সোনালী আলোর বৃষ্টি হ'য়ে নেমে আসতে পারি?'

হাঁস বললে, 'তা আর এমন কী পারো। ওতে কার কোন লাভ হবে তা আমি তো ভেবে পাইনে। ষাঁড়ের মতো লাঙল চালাতে

পারো ? কি ঘোড়ার মতো গাড়ি টানতে ? কি কুকুরের মতো বাড়ি পাহারা দিতে ? তা যদি পারো তবে বুঝবো যে তুমি কাজের লোক।'

হাউই অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে বললে, 'ছাখো বাছা, তুমি যে অতি নিচু স্তরের জীব তা বোঝাই যাচ্ছে। আমার মতো যারা মানী লোক, তারা কখনো কাজের লোক হয় না। আমাদের বিশেষ কতগুলো গুণ থাকে, তা-ই যথেষ্ট। যথেষ্ট বললে কম বলা হয়, তারও বেশি। কোনোরকম কাজের প্রতিই আমার মনের কোনো টান নেই, বিশেষ ক'রে যে-ধরনের কাজকর্ম তুমি পছন্দ করো ব'লে মনে হচ্ছে তার প্রতি তো একেবারেই নেই। আমি সব সময় এই মতই প্রচার করি যে যাদের কিছুই করবার নেই, পরিশ্রম তাদেরই আশ্রয়।'

হাঁস বেচারা ভালোমানুষ গোছের, ঝগড়াঝাঁটি তার আসে না। তাই সে বললে, 'বেশ, বেশ, নানা মুনির নানা মত। যা-ই হোক, তুমি এখন থেকে এখানেই থাকবে তো ?'

হাউই ব'লে উঠলো, 'আরে না, না! আমি অতিথি মাত্র। মাননীয় অতিথি! আসল কথা, জায়গাটা আমার বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না। এখানে নির্জনতাও নেই, আমার মেলামেশা করবার মতো লোকও নেই। বড্ড আধা-শহুরে! আমি খুব সম্ভব রাজ-সভাতেই ফিরে যাবো, কারণ আমি নিশ্চিত জানি যে পৃথিবীতে ভয়ানক একটা তোলপাড় তোলাই আমার নিয়তি।'

হাঁস বললে, 'আমিও এক সময়ে ভাবতুম পৃথিবীর বড়ো-বড়ো কাজে মন দেবো। এত জিনিস আছে যার সংস্কার দরকার। এই তো কিছুদিন আগে একটা সভা হ'লো, আমি ছিলুম সভানেত্রী। যা কিছু আমাদের অপছন্দ সে-সমস্তর বিরুদ্ধে

বড়ো-বড়ো প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়েছে ব'লে মনে হয় না। এখন আমি সংসারে মন দিয়েছি, ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত থাকি।'

হাউই বললে, 'আমাদের বেলায় সেটি হবার জো নেই। বড়ো-বড়ো কাজের জন্যই আমরা তৈরি হয়েছি। শুধু আমি নই, আমার সব আত্মীয়রাই তা-ই। নিতান্ত গরিব যে, সে-ও। আমরা দেখা দিলেই চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। আমি অবশ্য এখনো দেখা দিইনি ; কিন্তু যখন দেবো, সে এক অদ্ভুত জমকালো দৃশ্য হবে। সংসারী হবার কথা আমরা ভাবতেও পারিনে—ওতে বড়ো তাড়াতাড়ি বুড়ো ক'রে দেয়, আর মহৎ চিন্তা থেকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে।'

হাঁস বললে, 'বাস্তবিক! জীবনে যা-কিছু মহৎ তার কথা ভাবতেও ভালো লাগে। আচ্ছা, চলি এখন, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে,' ব'লে সে প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে সাঁতরে চ'লে গেলো।

হাউই চিৎকার ক'রে বললে, 'ফিরে এসো! ফিরে এসো বলছি! তোমাকে অনেক কথা আমার বলবার আছে।' কিন্তু হাঁস সে কথায় কানও দিলে না। তখন হাউই নিজের মনেই বললে, 'যাক, ও চলে যাওয়ায় বেঁচেছি। একেবারেই নিচু স্তরের জীব!' এ-কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে কাদার মধ্যে আরো একটু ডুবে গেলো। ঐ অবস্থাতেই সে প্রতিভাবানের নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ দুটি ছোটো ছেলে পাড় দিয়ে দৌড়ে ওদিকে এলো, তাদের হাতে একটি কেতলি আর খানিকটা শুকনো ডালপাতা।

হাউই বললে, 'এরা নিশ্চয়ই রাজার পারিষদ, আমাকে ডাকতে

এসেছে।' সে চেষ্টা করলো মুখের চেহারা যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে তুলতে।

ছেলে দুটির মধ্যে একজন ব'লে উঠলো, 'আরে, এখানে একটা ভাঙা লাঠি প'ড়ে আছে দেখেছিস্? কোত্থেকে এলো এটা?' ব'লে সে হাউইকে নর্দমা থেকে কুড়িয়ে নিলে।

হাউই মনে-মনে বললে, '**ভাঙা** লাঠি! অসম্ভব! **রাঙা** লাঠি, নিশ্চয়ই রাঙা লাঠি বলেছে। তার মানে সোনার লাঠি। এ তো খুবই সম্মানের কথা। বোধহয় আমাকে রাজার কোনো মন্ত্রী ব'লে ভুল করেছে।'

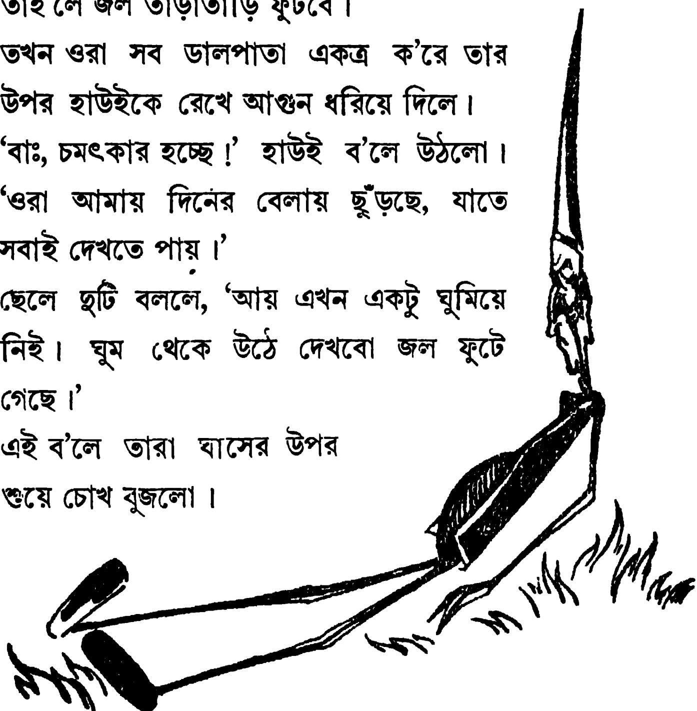
অন্য ছেলেটি বললে, 'আয় এটাও আগুনে দিয়ে দিই। তাহ'লে জল তাড়াতাড়ি ফুটবে।'

তখন ওরা সব ডালপাতা একত্র ক'রে তার উপর হাউইকে রেখে আগুন ধরিয়ে দিলে।

'বাঃ, চমৎকার হচ্ছে!' হাউই ব'লে উঠলো। 'ওরা আমায় দিনের বেলায় ছুঁড়ছে, যাতে সবাই দেখতে পায়।'

ছেলে দুটি বললে, 'আয় এখন একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘুম থেকে উঠে দেখবো জল ফুটে গেছে।'

এই ব'লে তারা ঘাসের উপর শুয়ে চোখ বুজলো।



হাউই বড়োই স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে গিয়েছিলো, তাই আগুন ধরতে অনেক সময় লাগলো।

হাউই খুব শক্ত আর সোজা হ'য়ে বললে, 'এইবার! এইবার! এইবার আমি আকাশে উঠে যাচ্ছি! আমি জানি তারাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে আমি উঠবো, চাঁদের চেয়ে অনেক উঁচুতে এমন কি সূর্যের চেয়েও উঁচুতে। এত উঁচুতে আমি উঠে যাবো যে—'

ফুর্‌র্‌র্, ফুর্-ফুর্‌র্‌র্ ফুর্‌র্‌র্—বলতে-বলতে সে সোজা উপরে উঠে গেলো।

'আশ্চর্য!' সে বললে। 'এই রকমই আমি চিরকাল চলবো। কী অসাধারণ আমার কৃতিত্ব!'

কিন্তু কেউ তাকে দেখলে না।

হাউই বললে, 'এবার আমি ফাটবো। সমস্ত পৃথিবীতে আমি আগুন ধরিয়ে দেবো, আর এমন আওয়াজ করবো যে পুরো এক বছর কেউ আর অন্য কথা বলবে না।'

এর পর ঠিকই ফাটলো সে। ঠাস! ঠাস! ঠাস! বারুদ গেলো পুড়ে। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত।

কিন্তু কেউ তাকে শুনলে না, সেই ছেলে দুটিও না, কারণ তারা দু'জনেই তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

তারপর তার রইলো শুধু লাঠিটা, আর সেই পড়লো একটা পাতিহাঁসের কাঁধের উপর। সে-বেচারা খালের ধারে একটু বেড়াচ্ছিলো, হঠাৎ ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো, 'কী সর্বনাশ! লাঠিবৃষ্টি হচ্ছে যে,' ব'লে সে তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে গিয়ে মুখ লুকোলো।

হাউই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'আমি জানতুম যে পৃথিবীতে একটা মস্ত তোলপাড় আমি তুলবো।' ব'লে সে নিবে গেলো।



স্বার্থপর দৈত্য



রোজ বিকেলে ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে ছোট্টো ছেলেমেয়েরা দৈত্যের বাগানে খেলতে যায়।

মস্ত সুন্দর বাগান, নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া। এখানে-ওখানে, ঘাসের মাথায়-মাথায় ফুটছে আকাশের তারার মতো ফুটফুটে ফুল; আর বসন্তকালে বারোটা পীচগাছে সোনালী আর শাদা অজস্র মঞ্জরী ধরতো আর হেমন্ত এলে ফলতো রাশি-রাশি পাকা সোনালী ফল। পাখিরা গাছে ব'সে এত মিষ্টি গান করতো যে ছেলেরা খেলা থামিয়ে চুপ ক'রে শুনতো সে-গান। 'কী মজা!' হেসে-হেসে তারা বলতো, 'কী মজা!'

একদিন কিন্তু দৈত্য ফিরে এলো। সে গিয়েছিলো তার মামাতো ভাই খোক্কসের বাড়ি বেড়াতে, সাত বছর ছিলো সেখানে। সাত বছর যখন কেটে গেলো, খোক্কসের সঙ্গে তার সব কথাও ফুরুলো, কেননা দৈত্যের কথার পুঁজি খুব বেশি ছিলো না। তখন সে ভাবলে, এবার বাড়ি ফেরা যাক। ফিরে দেখলে ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলা করছে তার বাগানে।

'কী করছো এখানে তোমরা?' খুব মোটা গলায় সে হাঁক দিলে, আর ছোটোরা ভয় পেয়ে দিলে দৌড়।

দৈত্য বললে, 'আমার বাগান হ'লো আমার নিজের—এ তো সোজা কথা। এখানে খেলতে হয় তো আমিই খেলবো—আর কাউকে খেলতে দেবো না।'

এই না ব'লে সে বাগানের চারদিকে তুললে প্রকাণ্ড উঁচু দেয়াল, আর একটা নোটিশ লটকিয়ে দিলে—

এই বাগানে ঢুকিলে
ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হইবে

বড়ো স্বার্থপর ছিলো দৈত্য।

বেচারা ছোটোদের এখন আর খেলবার জায়গা রইলো না। তারা গেলো রাস্তায় খেলতে, কিন্তু রাস্তা ভরা ধুলো আর শক্ত কাঁকর, মোটেও ভালো লাগলো না তাদের। ইস্কুল শেষ হ'য়ে গেলে তারা সেই উঁচু দেয়ালেরই আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতো। 'কী সুন্দর বাগান এর ভিতরে'—এ ছাড়া তাদের মুখে আর কথা নেই। 'কী মজা লাগতো সেখানে!'

তারপর বসন্তকাল এলো, আর সমস্ত দেশ ভরে ছোটো-ছোটো মঞ্জরী আর ছোটো-ছোটো পাখি।

শুধু দৈত্যের বাগানেই এখনো শীত।

সে-বাগানে তো কোনো শিশু নেই, তাই সেখানে কোনো পাখি গান গায় না, কোনো ফুলও ফোটে না। একবার টুকটুকে একটি ফুল ঘাসের তলা থেকে মাথা তুলেছিলো, কিন্তু যেই না সে দেখলো ঐ নোটিশ টাঙানো, ছোটোদের কথা ভেবে তার এমন মন-খারাপ হ'য়ে গেলো যে সে ফের ঢুকলো মাটির তলায়, পড়লো ঘুমিয়ে। খুশি হ'লো শুধু তুষার আর বরফ। তারা বললে, 'বসন্ত এ-বাগানে ঢুকতে ভুলে গেছে—কী মজা। বারো মাস এখানে আমরাই থাকবো।' তুষার বিছিয়ে দিলে ঘাসের উপর তার লম্বা শাদা চাদর, আর বরফ গাছগুলোকে এঁকে দিলে রুপোলী রঙে। কনকনে উত্তুরে হাওয়াকে তারা নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালে, হৈ-হৈ করতে-করতে সে এলো। সারা শরীর তার বিদঘুটে ভারী কাপড়ে জড়ানো, সারাটা দিন সে বাগানে দাপাদাপি চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছে। 'ভারি সুন্দর জায়গা তো,' সে বললে। 'একবার শিলাবৃষ্টি আসুক বেড়াতে।'

এলো শিলাবৃষ্টি। রোজ তিন ঘণ্টা ধ'রে দৈত্যের প্রাসাদের ছাদের উপর সে এমন হুড়মুড় হুড়দাড় ক'রে বেড়ালো যে ছাদের টালিগুলো সবই প্রায় ভেঙে গেলো; আর তারপর বাগানের মধ্যে প্রাণপণে সে ছুটোছুটি করতে লাগলো—সে একখানা কাণ্ড। পরনে তার ছাই রঙের কাপড় আর তার নিশ্বাস বরফের মতো ঠাণ্ডা।

জানলায় ব'সে, ঠাণ্ডা শাদা বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বার্থপর দৈত্য মনে-মনে বললে, 'এবার বসন্ত আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? শীতটা এখন কাটলেই হয়।'

কিন্তু দৈত্যের বাগানে না এলো বসন্ত, না এলো গ্রীষ্ম। সেখানে রইলো বারোমাস শীত; আর উত্তুরে হাওয়া আর শিলাবৃষ্টি, আর তুষার গাছপালার মধ্যে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগলো।

একদিন সকালে দৈত্য বিছানায় জেগে শুয়ে আছে এমন সময় ভারি সুন্দর গান এলো তার কানে। সে-গান তার কানে এমন মধুর লাগলো যে সে ভাবলে নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদের ওস্তাদরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু ছোট্ট একটি দোয়েল তার জানলার বাইরে ব'সে শিষ দিচ্ছিলো; কিন্তু দৈত্য কিনা অনেকদিন পাখির গান শোনেনি, তাই তার মনে হ'লো এমন গান পৃথিবীতে আর হয় না। তারপর তার মাথার উপর থামলো শিলাবৃষ্টির নাচ, থামলো উত্তুরে হাওয়ার গর্জন, আর খোলা জানলা দিয়ে ভারি মিষ্টি একটি গন্ধ এসে ছড়িয়ে পড়লো। 'বোধ হচ্ছে এতদিনে বসন্ত এলো,' ব'লে দৈত্য এক লাফে বিছানা থেকে উঠে জানলার বাইরে তাকালো।

কী দেখলো সে?

অতি অপরূপ দৃশ্য তার চোখে পড়লো। দেয়ালের মধ্যে ছোটো

একটু গর্ত ছিলো, ;তাই দিয়ে কেমন ক'রে শিশুরা ঢুকেছে ভিতরে, গাছের ডালে ব'সে দুলছে। প্রত্যেক গাছে একটি ক'রে শিশু। আর গাছেরা ওদের দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়েছে যে তারা ফুটিয়েছে শরীর ভ'রে কত ফুলের মঞ্জরী, আর নাড়ছে ফুলন্ত ডালগুলো ওদের মাথার উপর। পাখিরা খুশিতে কিচমিচ করতে-করতে চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর সবুজ ঘাসের ফাঁক দিয়ে ফুলেরা হেসে-হেসে উঁকি দিচ্ছে। সবই সুন্দর, শুধু দূরের এক কোণে এখনো রয়েছে শীত। সেখানে একটা গাছের তলায় ছোটো একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। এতই ছোটো সে যে গাছটার একটা ডালও সে নাগাল পাচ্ছে না, কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সে-গাছটাও এখনো একেবারে বরফে আর তুষারে মোড়া, উত্তরে হাওয়া তার মাথার উপর দিয়ে গোঁ-গোঁ ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে। 'এসো, উঠে এসো,' ব'লে গাছটা তার ডালগুলো যতটা পারছে নুইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটি বড়োই ছোটো।

বাইরে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে দৈত্যের হৃদয়ে দয়া হ'লো। 'সত্যি, কী স্বার্থপরের মতো কাজ আমি করেছি।' সে বললে। 'এখন বুঝতে পারছি বসন্ত কেন আমার বাগানে আসেনি। যাই, ঐ ছোট্ট ছেলেটিকে গাছের ডালে তুলে দিয়ে আসি। তারপর এই দেয়াল আমি ভেঙে ফেলবো, আর আমার এই বাগানে চিরকাল হবে ছোটোদের খেলা।' সে যা করেছিলো তার জন্যে সত্যি অনুতাপ হ'লো তার।

গেলো সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সামনের দরজাটা আস্তে খুলে বেরিয়ে এলো বাগানে। কিন্তু শিশুরা যেই তাকে দেখলো, অমনি ভয়ে আঁতকে উঠে দিলে দৌড়—আর সমস্ত বাগানে আবার শীত নেমে এলো। রইলো শুধু সেই ছোট্ট ছেলে ; তার

চোখ কিনা জলে ভ'রে ছিলো, তাই দৈত্যকে সে দেখতে পায়নি। তখন দৈত্য করলে কী, চুপি-চুপি ওর পিছনে এসে ওকে আস্তে তুলে গাছের উপর বসিয়ে দিলে। তক্ষুনি গাছটা হাজার মঞ্জরীতে ফুটে উঠলো, পাখিরা তার ডালে-ডালে ব'সে গান ধরলো, আর ছোট্ট ছেলেটি খুশিতে দৈত্যের গলা জড়িয়ে ধরলো। তখন অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারলো যে দৈত্য আর আগেকার মতো বদ্‌মেজাজি নেই, দৌড়ে ফিরে এলো তারা, তাদের সঙ্গে ফিরে এলো বসন্ত। 'শুনেছো ছোটোরা, এ-বাগান এখন তোমাদের।' এই ব'লে মস্ত এক কুড়ুল হাতে নিয়ে সে ভেঙে ফেললে দেয়াল। আর দুপুরবেলা বাজারে যাবার পথে সবাই অবাক হ'য়ে দেখলে যে দৈত্য তার বাগানে ছোটোদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলছে—অত সুন্দর বাগান কখনো চোখে ছ্যাখেনি তারা।

সারাদিন খেলা করলে তারা, তারপর সন্ধেবেলায় এলো দৈত্যের কাছে বিদায় নিতে।

'কিন্তু তোমাদের ছোট্ট সঙ্গীকে তো দেখছি না,' বললে দৈত্য। 'যাকে আমি গাছের উপর তুলে দিলাম।' সে ধরেছিলো তার গলা জড়িয়ে, তাই দৈত্য তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলো। 'আমরা জানিনে তো,' ছোটোরা জবাব দিলে। 'সে চ'লে গেছে বুঝি?'

'তাকে বোলো তোমরা, কাল যেন সে এখানে আসেই, যেন না ভোলে'—বললে দৈত্য। কিন্তু ছোটোরা তো জানে না সে কোথায় থাকে, আগে কখনো ছ্যাখেওনি তাকে।

দৈত্যের বড়ো মন খারাপ হ'য়ে গেলো।

রোজ বিকেলবেলা, ইস্কুল-ছুটির পর ছোটোরা আসে দৈত্যের সঙ্গে খেলতে। কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি, দৈত্য যাকে ভালোবেসেছিলো



তাকে আর দেখা যায় না। ছোটোদের সকলের সঙ্গেই দৈত্যের খুব ভাব, কিন্তু তার সেই প্রথম ছোট্ট বন্ধুটির জন্য তার বড়ো মন-কেমন করে, প্রায়ই বলে তার কথা। 'বড়ো খুশি হতাম তার দেখা পেলে।'

বছরের পর বছর কেটে গেলো, দৈত্য এমন বুড়ো হয়েছে, সে আর ছুটোছুটি খেলতে পারে না ; মস্ত চেয়ারে ব'সে ব'সে ছোটোদের খেলা ছাখে আর মনে-মনে নিজের বাগানের তারিফ করে। 'অনেক সুন্দর ফুল আমার আছে,' সে বললে, 'কিন্তু এই শিশুরা হচ্ছে ফুলেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।'

শীতের এক সকালবেলা সে তাকালো জানলা দিয়ে বাইরে। এখন আর শীতের উপরে তার রাগ নেই, কেননা সে জানে এ তো বসন্তই ঘুমিয়ে আছে আর ফুলেরা নিচ্ছে জিরিয়ে।

হঠাৎ অবাক হ'য়ে সে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বার-বার তাকাতে লাগলো। কী আশ্চর্য! বাগানের ঐ দূরের কোণে একটা গাছ ফুটফুটে শাদা মঞ্জরীতে ঢাকা। ডালগুলো তার সব সোনালী আর তা থেকে ঝুলছে ঝকঝকে রুপোলী ফল, আর তার তলায় দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট ছেলেটি, যাকে সে ভালোবেসেছিলো।

গেলো সে দৌড়ে নিচে নেমে, গেলো বেরিয়ে বাগানে। তাড়াতাড়ি ঘাস পার হ'য়ে সে এলো, সেই শিশুর কাছে। আর খুব কাছে যখন এলো, রাগে লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ, ব'লে উঠলো, 'কার এমন সাহস যে তোমাকে মেরেছে?' কারণ ঐ ছোট্ট ছেলেটির ছোটো তুটি হাতে সে দেখতে পেলো রক্তের দাগ, আর রক্তের দাগ তার ছোট্ট তুটি পায়ে।

'কার এত সাহস তোমাকে মেরেছে?' দৈত্য চীৎকার ক'রে বললে, 'বলো আমাকে এক্ষুনি, আমি আমার লম্বা তলোয়ার বের ক'রে তাকে শেষ করবো।'

ছোটো ছেলেটি বললে, 'না—না, এ-আঘাত ভালোবাসার, আর-কিছু নয়।'

'কে তুমি?' দৈত্য বললে। আর তার মনে কেমন একটা অদ্ভুত

ভয়ের ভাব নেমে এলো—ঐ শিশুর সামনে নতজানু হ'য়ে সে ব'সে পড়লো।

ছোটো ছেলেটি দৈত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'আমাকে তুমি তোমার বাগানে খেলা করতে দিয়েছিলে—আজ তুমি আসবে আমার বাগানে—সে হ'লো স্বর্গ।'

আর বিকেলবেলায় যখন ছেলেমেয়ের দল হুটোপুটি ক'রে বাগানে এসে ঢুকলো তারা দেখলো দৈত্য সেই গাছটার নিচে প'ড়ে আছে, সারা শরীর তার শাদা মঞ্জরীতে ঢাকা।



সুখী রাজপুত্র

শহরের অনেক অনেক উঁচুতে, প্রকাণ্ড উঁচু থামের উপরে সুখী রাজপুত্রের মূর্তি। সমস্ত শরীর তার পাতলা সোনার পাতে মোড়া, চোখ তার উজ্জ্বল দুটি নীলা, আর তার তলোয়ারের হাতলে মস্ত একটা চুনি ঝলমল করছে।

সবাই তাকে খুব বাহবা দেয়। নগর-পরিষদের একজন মন্ত্রী বলেন, 'বাঃ কী সুন্দর!' তাঁর ইচ্ছে, সুন্দর জিনিসের সমজদার হিসেবে তাঁর নাম হোক। তারপরেই তাড়াতাড়ি বলেন, 'তবে এ দিয়ে অবশ্য কোনো কাজ হয় না।' পাছে লোকে ভাবে তিনি কাজের লোক নন। মস্ত কাজের লোক তিনি।

ছোটো একটি ছেলে কেঁদে-কেঁদে বলে, 'আমাকে চাঁদ ধ'রে দাও, আমাকে চাঁদ পেড়ে দাও।' তার মা বিজ্ঞের মতো বলেন, 'ঐ সুখী রাজপুত্রের মতো হ'তে পারো না তুমি? সে তো কখনো কোনো জিনিসের জন্য কাঁদবার কথা মনেও আনে না।' আশা যার ব্যর্থ হয়েছে এমন একজন লোক ঐ আশ্চর্য মূর্তির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মনে-মনে বলে: 'পৃথিবীতে কেউ যে একজন সুখী এ-কথা ভাবতেই ভালো।'

অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বলে, 'ঠিক দেবদূতের মতো দেখতে।'

'কী ক'রে জানলে?' তাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই ধমকে ওঠেন, 'দেবদূত দেখেছো কখনো?'

'দেখেছি বই কি, স্বপ্নে দেখিছি।'

কথাটা শুনে অঙ্কের মাস্টারমশাই গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, ছেলে মেয়েরা স্বপ্ন দেখুক এটা মোটেও তাঁর পছন্দ নয়।

একরাত্রে সেই শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেলো ছোট্ট দোয়েল পাখি। তার বন্ধুরা দেড় মাস আগে গেছে মিশরদেশে চলে, কিন্তু

সে ছিলো পিছনে প'ড়ে, কারণ তার ইচ্ছে অতি সুন্দর ছিপছিপে একটি বেতকে সে বিয়ে করে। সেদিন মস্ত একটা হলদে ফড়িংকে তাড়া ক'রে-ক'রে নদীর উপর দিয়ে সে যখন উড়ে যাচ্ছে সেই পাতলা ছিপছিপে বেতকে দেখে তার এত ভালো লাগলো যে সে তক্ষুনি থেমে গেলো তার সঙ্গে আলাপ করতে। 'আমাকে বিয়ে করবে?' আসল কথাটা একবারেই পাড়লে দোয়েলপাখি, আর শ্রীমতী বেত মাথা নিচু ক'রে নমস্কার করলে। দোয়েল তাকে ঘিরে উড়ে-উড়ে বেড়ালো, পাখার ডগা দিয়ে জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ছলছল রুপোলী ঢেউ তুলে। এমনি ক'রে তাদের ভাব জমলো, এমনি ক'রে কাটলো তাদের সমস্ত গ্রীষ্ম।

অন্যান্য দোয়েলরা টিটকিরি দিয়ে বললে, 'ওঃ, ভা—রি বিয়ে হচ্ছে! মেয়ের তো এক পয়সা সম্বল নেই, তার উপর আত্মীয়ের গুষ্টি!' আর সত্যি, নদীটা ভ'রেই বেতের ঝোপ। তারপর শীত যখন পড়ি-পড়ি, তারা সব উড়ে চললো ঝাঁক বেঁধে।

ওরা তো গেলো চ'লে, এদিকে আমাদের দোয়েলের বড়ো একা-একা লাগছে। ভাবী স্ত্রীর সঙ্গেও আর সময় কাটে না। 'মোটে কথাই নেই ওর মুখে! বেশ সংসারী মেয়ে, তা ঠিক; কিন্তু আমি দেশ-বিদেশ বেড়াতে ভালোবাসি, তাই আমার স্ত্রীরও বেড়াতে ভালো না-বাসলে চলবে না।'

শেষ পর্যন্ত সে কাছে গিয়ে বললে, 'যাবে তুমি আমার সঙ্গে?' কিন্তু শ্রীমতী বেত মাথা নাড়লেন, দেশের মাটির উপর এমনই তাঁর টান।

ব'লে উঠলো দোয়েল, 'তাহ'লে তোমার সঙ্গে হ'লো না। চললুম আমি পিরামিডের দেশে।' গেলো সে উড়ে।

সমস্ত দিন উড়লো সে, সন্ধেবেলা এসে পৌঁছলো সেই শহরে।

'রাতটা কোথায় কাটাই,' মনে-মনে সে বললে, 'এই শহর আমার জন্য সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে আশা করি।'
তারপরে তার চোখে পড়লো উঁচু থামের উপর রাজপুত্রের মূর্তি। 'ঐ তো আমার থাকবার জায়গা!' সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'জায়গাটি বড়ো সুন্দর তো—আর কী হাওয়া!'
এই না ব'লে সে নেমে পড়লো ঠিক সুখী রাজপুত্রের দু'পায়ের মাঝখানে।

'বাঃ,' চারদিকে তাকিয়ে সে আস্তে ব'লে উঠলো, 'শোবার জন্যে সোনার ঘর পেয়েছি আমি।' ব'লে সে পাখার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুতে যাবে, এমন সময় বেশ বড়ো এক ফোঁটা জল তার গায়ে পড়লো। 'অবাক কাণ্ড!' সে ব'লে উঠলো, 'আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, তারাগুলো ঝকঝক করছে, তবু কিনা বৃষ্টি! এই উত্তর ইওরোপের আবহাওয়া সত্যি বড়ো বিশ্রী!' তারপর আর-এক ফোঁটা পড়লো।
'বৃষ্টিই যদি আটকাতে না পারলো তবে অতো বড়ো একটা মূর্তি দিয়ে লাভটা কী? নাঃ, ভালো দেখে একটা চিমনি খুঁজে নিতে হচ্ছে।' ব'লে সে সেখান থেকে উঠতে গেলো।
কিন্তু তার পাখা খুলতে-না-খুলতেই আরো এক ফোঁটা পড়লো তার গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে উপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো—চুপ, চুপ! কী, কী দেখলো সে?
সুখী রাজপুত্রের দু'চোখ ভরা জল, তার সোনার গাল বেয়ে দরদর করে জল ঝরছে। চাঁদের আলোয় এমন সুন্দর তার মুখখানা যে ছোট্ট দোয়েলের হৃদয় করুণায় ভরে গেলো।
'কে তুমি?' সে জিগ্‌গেস করলে।

'আমি সুখী রাজপুত্র।'

'তবে তুমি কাঁদছো কেন? আমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছো যে!'

মূর্তি জবাব দিলে, 'যখন বেঁচে ছিলুম, আর যখন আমার মানুষের হৃদয় ছিলো তখন কান্না কাকে বলে আমি জানতুম না। কারণ আমি থাকতুম চিরসুখের প্রাসাদে, সেখানে দুঃখকে ঢুকতে দেয়া হ'তো না। দিনের বেলায় আমি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলে বেড়াতুম; সন্ধেবেলায় স্বর্ণভবনে আমি হতুম নৃত্যের নেতা। বাগান ঘিরে ছিলো মস্ত উঁচু দেয়াল—তার ওপিঠে কী আছে আমি কখনো জিগগেস করিনি, কারণ আমার চারদিকে সবই ছিলো অতি সুন্দর। আমার পারিষদরা আমাকে বলতো সুখী রাজপুত্র—আর ফুর্তিতেই যদি সুখ হয় তবে সত্যি আমি সুখী ছিলুম। এমনি আমার জীবন কাটলো, এমনি ক'রে আমার মৃত্যু হ'লো। আর এখন ম'রে যাওয়ার পর আমাকে ওরা এত উঁচুতেই বসিয়েছে যে আমি চারদিকে তাকিয়ে আমার নগরের সমস্ত কুশ্রীতা আর দারিদ্র্য দেখতে পাই; আর যদিও আমার হৃদয় এখন সীসের তৈরি, তবু না-কেঁদে আমার উপায় থাকে না।'

'ও, তুমি তাহ'লে আগাগোড়া সাচ্চা সোনা নও!' দোয়েল বললে। অবিশ্যি মনে-মনে বললে, কেননা সে ভারি ভদ্র, কখনো কাউকে শুনিয়ে এ-রকম কোনো কথা বলে না।

এদিকে মূর্তি নিচু গলায় গানের মতো গুনগুন ক'রে বলতে লাগলো, 'অনেক দূরে এক ছোট্ট রাস্তায় আছে এক জীর্ণ বাড়ি। একটা জানালা তার খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় একটি মেয়ে টেবিলের ধারে ব'সে আছে মুখ তার রোগা

ফ্যাকাশে, হাত দু'খানা দগদগে লাল, ছুঁচের খোঁচা খেয়ে খেয়ে শক্ত হ'য়ে গেছে। শেলাই ক'রে তার দিন গুজরান হয়। রানীর সখীদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী তার সাটিনের কাপড়ে সে বড়ো বড়ো সূর্যমুখী ফুল তুলছে রঙিন সুতো দিয়ে; রাজসভায় শিগগিরই যে-নাচ হবে তাতে তিনি সেটা পরবেন। ঘরের এক কোণে তার ছোট্ট ছেলে অসুখে প'ড়ে। ছেলেটির জ্বর হয়েছে, কমলালেবু খাবার জন্যে সে বায়না ধরেছে। নদীর জল ছাড়া আর-কিছু তার মা দিতে পারছে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ওগো দোয়েল, ওগো লক্ষ্মী ছোট্ট পাখি, তুমি আমার তলোয়ারের হাতল থেকে চুনিটা তুলে নিয়ে সেই মেয়েকে দিয়ে এসো। আমার পা তো এখানে আটকানো, আমার তো নড়বার উপায় নেই।'

দোয়েল বললে, 'মিশরদেশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নীল নদীর উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আমার বন্ধুরা, বড়ো-বড়ো পদ্ম-ফুলের সঙ্গে গল্প করছে। শিগগিরই ওরা ঘুমোতে যাবে মৃত সম্রাট স্তম্ভে; সেখানে স্বয়ং সম্রাট তাঁর ছবি-আঁকা কফিনে শুয়ে আছেন। গায়ে তাঁর হলুদ রঙের কাপড় জড়ানো, গায়ে তাঁর সুগন্ধি মশলা মাখানো। গলায় ফিকে সবুজ পাথরের মালা, আর হাত দু'খানা যেন শুকনো পাতার মতো।'

'ওগো দোয়েল, ওগো ছোট্ট পাখি, তুমি কি একরাত্রি আমার কাছে থাকবে না, তুমি কি যাবে না আমার দূত হয়ে? ছেলেটির বড়ো তেষ্টা পেয়েছে, তার মা-র কী কষ্ট!'

দোয়েল জবাব দিলে, 'ছোটো ছেলেদের আমি বিশেষ পছন্দ করি না। গেলো বছরের গ্রীষ্মে নদীর উপরে বাসা নিয়েছিলাম আমি। সেখানকার কলওলার দুটো অসভ্য ছেলে কেবলই আমাকে ঢিল

ছুঁড়তো। অবিশ্যি তার একটাও আমার গায়ে লাগেনি, কারণ আমরা দোয়েলেরা হচ্ছি সেরা উড়িয়ে, তাছাড়া পাখা চালাবার ওস্তাদির জন্যে আমার বংশই নাম-করা—তবু গায়ে না-লাগলেও অপমান তো বটে!'

কিন্তু সুখী রাজপুত্রকে এমন মন-মরা দেখাচ্ছিলো যে দোয়েলের মনে কষ্ট হ'লো। তাই সে বললে, 'এখানে বড়ো ঠাণ্ডা, কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার কাছে থাকবো, হবো তোমার দূত।'

'ছোট্ট দোয়েল, তুমি বড়ো ভালো,' বললে রাজপুত্র।

তারপর দোয়েল রাজপুত্রের তলোয়ারের হাতল থেকে মস্ত চুনিটা ঠুকরে তুলে নিলে, সেটা ঠোঁটে ক'রে উড়ে গেলো শহরের অনেক ছাদের উপর দিয়ে।

গেলো সে উড়ে গির্জার উপর দিয়ে, সেখানে শ্বেতপাথরের কত দেবদূতের মূর্তি। গেলো সে প্রাসাদের ধার দিয়ে, শুনলো নাচ-গানের শব্দ। রূপসী একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায় একটি যুবকের সঙ্গে। যুবক বললে, 'ছাখো ছাখো কী সুন্দর তারা।' মেয়েটি জবাব দিলে, 'রাজসভায় নাচের দিনে আমার নতুন কাপড়টা তৈরি হ'লেই হয়। আমি ওর উপর সূর্যমুখী ফুল তুলতে দিয়েছি, কিন্তু সেলাইওয়ালিরা বড্ড কুড়ে!'

গেলো সে উড়ে নদীর উপর দিয়ে, দেখলো জাহাজের মাস্তুলে-মাস্তুলে আলো জ্বলছে, বন্দরের ধারে-ধারে বেচা-কেনার ভিড়, দাঁড়িপাল্লায় কত টাকা-পয়সা মাপা হচ্ছে। তারপরে সেই জীর্ণ বাড়িতে পৌঁছে সে উঁকি দিলে ভিতরে। ছোট্ট ছেলেটি বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরে ছটফট করছে, মা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দোয়েল ঢুকলো ঘরে, মস্ত চুনিটা রাখলো মেয়েটির কোলের উপর, তারপর আস্তে বিছানার উপর দিয়ে উড়লো, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো

ছেলেটির কপালে। 'কী ঠাণ্ডা,' ছেলেটি বললে, 'নিশ্চয়ই আমি ভালো হ'য়ে উঠেছি।' ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর দোয়েল সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে গিয়ে সে যা ক'রে এসেছে সব বললে। 'ভারি অদ্ভুত! এত তো শীত, কিন্তু এখন আমার মোটেও ঠাণ্ডা লাগছে না।'

রাজপুত্র বললে, 'তুমি একটা ভালো কাজ ক'রে এসেছো, তাই ও-রকম লাগছে।' কথাটা শুনে ছোট্ট দোয়েল ভাবতে লাগলো, একটু পরেই পড়লো ঘুমিয়ে। ভাবতে আরম্ভ করলেই তার ঘুম পেয়ে যেতো।

যখন ভোর হ'লো সে নদীতে গেলো নাইতে। সেই সময়ে পুলের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পক্ষীতত্ত্বের অধ্যাপক ব'লে উঠলেন, 'এ তো বড়ো আশ্চর্য ঘটনা। শীতকালে দোয়েল!' তারপর তিনি এ-বিষয়ে মস্ত লম্বা চিঠি লিখলেন খবরের কাগজে। সে-চিঠি সকলেই আওড়াতে লাগলো, কেননা তাতে এমন অনেক কথা ছিলো যার মানে কেউ জানে না।

'আজ রাত্রে আমি যাবো মিশরদেশে।' কথাটা ভেবে দোয়েলের মনে খুব ফুর্তি হ'লো। সেই শহরের যত বড়ো-বড়ো বাড়ি আর স্তম্ভ সব সে দেখে বেড়ালো, গির্জের চুড়োয় ব'সে কাটালো অনেকক্ষণ। যেখানেই সে গেলো, চড়ুইপাখিরা কিচমিচ শব্দ ক'রে বলতে লাগলো, 'দেখেছো এই বিদেশিকে, একজন কেউ-কেটা হবে!' আর সে-কথা শুনে দোয়েলের ফুর্তি আরো বেড়েই গেলো।

চাঁদ যখন উঠলো, সে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে। 'মিশরদেশে কোনো কাজ থাকে তো বলো। আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।'

'ওগো দোয়েল, ওগো ছোট্ট পাখি,' বললে রাজপুত্র, 'তুমি কি আর এক রাত্রি আমার সঙ্গে থাকবে না ?'

'মিশরদেশে সবাই আমার প্রতীক্ষা করেছে,' দোয়েল বললে, 'কাল আমার বন্ধুরা দ্বিতীয় জলপ্রপাত পর্যন্ত উড়ে যাবে। সেখানে লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে জল-ঘোড়ারা খেলা করছে, আর লাল পাথরের প্রকাণ্ড সিংহাসনে আছেন দেবতা মেমন। তিনি সমস্ত রাত ব'সে তারাদের দেখেন, আর ভোরবেলায় শুকতারা যখন জ্বলজ্বল করে তখন একবার আনন্দধ্বনি ক'রে ওঠেন, তারপর চুপ। দুপুরবেলায় হলুদ রঙের সিংহরা আসে ঝরনার ধারে জল খেতে। চোখ তাদের টলটলে সবুজ, আর তাদের গর্জন জল-প্রপাতের শব্দের চেয়েও ভয়ানক।'

রাজপুত্র বললে, 'দোয়েল, দোয়েল ওগো ছোট্ট পাখি, শহর পার হ'য়ে অনেক দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট চিল-কোঠার ঘরে এক যুবক ব'সে আছে টেবিলে হাত রেখে। টেবিল ভরা কাগজ-পত্র, আর পাশে একটা গেলাশে শুকিয়ে-যাওয়া একগুচ্ছ ফুল। চুল তার বাদামী রঙের, ঠোঁট তার ডালিমফলের মতো লাল, বড়ো-বড়ো চোখ দুটি যেন স্বপ্নে ভরা। থিয়েটরওলাদের জন্য সে একটি নাটক লিখতে চেষ্টা করছে ; কিন্তু তার এত শীত করছে যে আর লিখতে পারছে না। ঘরে তার আগুন নেই, খিদেয় সে অবসন্ন।'

আসলে দোয়েল ভারি ভালোমানুষ তাই সে বললে : 'আচ্ছা, থাকবো তোমার সঙ্গে আর এক রাত্রি। কী করতে হবে বলো। আর একটা চুনি দিয়ে আসবো ওকে ?'

'হায়রে, আমার যে আর চুনি নেই, এখন আমার চোখ দুটিই সম্বল। এই যে নীলা দেখছো, ভারতবর্ষ থেকে হাজার-হাজার

বছর আগে এরা এসেছিলো, এদের মতো আর পৃথিবীতে নেই। এর একটা উপড়ে নিয়ে সেই যুবককে দিয়ে এসো। তা বেচে সে কাঠ কিনতে পারবে, খাবার কিনতে পারবে, শেষ করতে পারবে তার নাটক লেখা।'

'না রাজপুত্র, এ আমি কিছুতেই পারবো না,' ব'লে দোয়েল কাঁদতে আরম্ভ করলে।

'দোয়েল, দোয়েল, লক্ষ্মী পাখি, আমি যা বলছি তা-ই করো।' দোয়েল আর কী করে, রাজপুত্রের এক চোখ উপড়ে নিয়ে সে উড়ে গেলো সেই যুবকের চিল-কোঠায়। ঘরের ছাদে একটা গর্ত ছিলো, তাই তার পৌঁছতে কিছুই কষ্ট হ'লো না। যুবকটি দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলো, তাই পাখার শব্দ সে শুনতে পেলো না। যখন সে চোখ মেললো সে দেখলো একটি অপরূপ নীলা তার শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলির মধ্যে প'ড়ে আছে।

'তাহলে ওরা আমাকে সমাদর করতে শিখেছে,' সে ব'লে উঠলো। 'এটি নিশ্চয়ই আমার লেখার কোনো ভক্ত দিয়ে গেছে। এবারে নাটকটা শেষ করা যাক।' তার দস্তুরমতো মন ভালো হ'য়ে গেলো।

দোয়েল পরের দিন বেড়াতে গেলো বন্দরে। মস্ত একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর ব'সে-ব'সে সে দেখতে লাগলো খালাসিরা খোলের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড সব সিন্ধুক দড়ি দিয়ে টেনে টেনে তুলছে। একটা উঠে আসে, আর তারা চেঁচিয়ে ওঠে: 'হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো।' 'আমি যাচ্ছি মিশরদেশে,' সে বললে। কিন্তু তার কথা কেউ শুনলো না, আর চাঁদ যখন উঠলো সে উড়ে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে।

'তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম।'

‘দোয়েল, ওগো দোয়েল, লক্ষ্মী পাখি, আর একটা রাত্রি কি আমার কাছে তুমি থাকবে না ?’

দোয়েল বললে, ‘এখন শীতকাল, শিগগিরই বরফ পড়া শুরু হবে। মিশরদেশে তাল-খেজুরের পাতায়-পাতায় চমৎকার মিষ্টি রোদ, আর কুমিরগুলো কাদার মধ্যে শুয়ে অলসভাবে চারদিকে তাকাচ্ছে। আমার বন্ধুরা বাসা বাঁধছে বালবেকের মন্দিরে, ফুটফুটে শাদা আর গোলাপি ঘুঘুরা তাদের দেখছে আর নিজেদের মধ্যে ঘু-ঘু করছে। শোনো রাজপুত্র, আমাকে এখন যেতেই হবে; কিন্তু তোমার কথা কখনো আমি ভুলবো না; আর সামনের বসন্তকালে, যে-মণি দুটো তুমি দিয়ে দিলে, তার বদলে খুব সুন্দর চুনি আর নীলা নিয়ে আসবো তোমার জন্য। চুনি হবে লাল গোলাপের চেয়েও লাল, আর নীলা হবে বিশাল সমুদ্রের মতো নীল।’

সুখী রাজপুত্র বললে, ‘নিচের ঐ পার্কে একটি ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশেলাই বেচে। তার দেশেলাইগুলো সব নর্দমায় প’ড়ে নষ্ট হ’য়ে গেছে। এদিকে বাড়িতে কিছু পয়সা নিয়ে যেতে না-পারলে তার বাপ তাকে ধ’রে মারবে। না আছে তার জুতো, না আছে মোজা, মাথায় টুপিও নেই। তুমি আমার আর-একটা চোখ উপড়ে নিয়ে তাকে দিয়ে এসো, তা হ’লেই তার বাপ আর তাকে মারবে না।’

দোয়েল বললে, ‘আরো এক রাত্রি আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি, কিন্তু তোমার চোখ আমি উপড়ে তুলবো কী ক’রে? তা হ’লে তুমি একেবারে অন্ধ হ’য়ে যাবে যে।’

‘দোয়েল, ওগো দোয়েল, ছোট্ট দেয়েল, আমি যা বলছি তা-ই করো,’ বললে রাজপুত্র।

দোয়েল আর কী করে, রাজপুত্রের বাকি চোখটি তুলে নিয়ে শোঁ ক'রে উড়ে গেলো। ছোট্ট দেশলাইওয়ালির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে নীলাটি ফেলে দিলে তার হাতের মুঠোর মধ্যে। মেয়েটি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, কী সুন্দর এক টুকরো কাচ,' তারপর হাসতে-হাসতে দৌড় দিলে বাড়ির দিকে।

দোয়েল রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বললে, 'তুমি তো অন্ধ হ'য়ে গেলে। এখন আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো।'

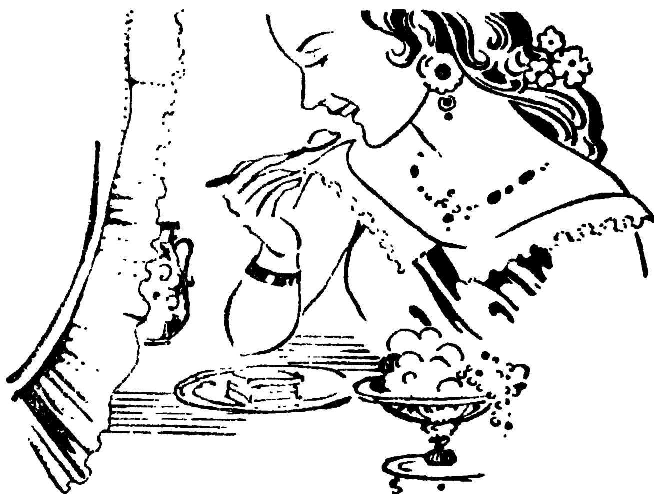
'না, না, তা হতে পারে না,' রাজপুত্র বললে। 'শোনো, দোয়েল তুমি আজই মিশরদেশে চলে যাও।'

'আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো,' ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

পরের দিন রাজপুত্রের কাঁধে ব'সে-ব'সে সে তাকে কত অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত গল্প শোনালো। শোনালো লাল সারসপাখির কথা, নীল নদীর ধারে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যারা ঠোঁটের ফাঁকে সোনালী মাছ ধরে ; শোনালো স্ফিঙ্কস্-এর গল্প, যে সব জানে, যার বয়স পৃথিবীর সমান আর মরুভূমিতে যার বাসা ; শোনালো সওদাগরের গল্প, যারা উটেদের পাশে-পাশে আস্তে হেঁটে চ'লে যায় অ্যাম্বরের মালা হাতে নিয়ে ; আর চাঁদের পাহাড়ের রাজার গল্প, যে মেহগনির মতো কালো, আর পূজো করে প্রকাণ্ড একটা স্ফটিকের ; আর মস্ত সবুজ সাপের গল্প, যে ঘুমিয়ে থাকে খেজুর গাছের ছায়ায় আর মধু খায় কুড়ি জন পুরোহিতের হাত থেকে ; আর ক্ষুদে মানুষের গল্প, যারা চওড়া শালপাতায় চ'ড়ে বড়ো-বড়ো হ্রদ পার হ'য়ে যায় আর প্রজাপতিদের সঙ্গে যাদের যুদ্ধ বেধেই আছে।

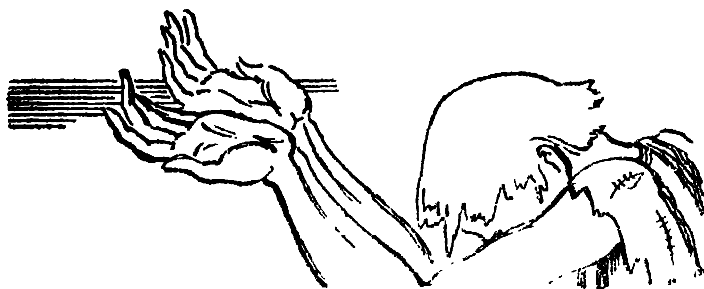
'ওগো ছোট্ট দোয়েল,' রাজপুত্র বললে, 'তুমি তো আমাকে অনেক আশ্চর্য কথা শোনালে, কিন্তু মানুষের দুঃখ অন্য-কিছুর চেয়ে বেশি আশ্চর্য। দুঃখের মতো এত বড়ো রহস্য আর নেই। ওগো দোয়েল, তুমি আমার শহরের উপর দিয়ে উড়ে এসো, তারপর আমাকে বলো সেখানে কী দেখলে।'

উড়ে বেড়ালো দোয়েল মস্ত শহরের উপর দিয়ে। দেখলে বড়ো-লোকেরা ফুর্তি করছে যে-সব চমৎকার বাড়ির ভিতরে, তারই ফটকের বাইরে ব'সে আছে ভিখিরির দল। অন্ধকার গলির ভিতর



দিয়ে সে উড়ে গেলো; দেখলে, খেতে-না-পাওয়া ছেলেমেয়েরা ফ্যাকাশে শাদা মুখে কালো-কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা সাঁকোর তলায় সে দেখলে দুটি ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে আছে, কোনোরকমে যদি শরীর গরম থাকে। 'উঃ, কী খিদে পেয়েছে!' তারা বললে। এমন সময় পাহারাওলা এসে

চেঁচিয়ে উঠলো : 'হেই—ওখানে শুয়েছিস কেন? ওঠ্।' আস্তে আস্তে ওরা উঠে চ'লে গেলো বৃষ্টির মধ্যে।



দোয়েল ফিরে এসে রাজপুত্রকে সব কথা বললে।

রাজপুত্র বললে, 'আমার সমস্ত শরীর সোনার পাতে মোড়া। তুমি প্রত্যেকটি পাতা তুলে নাও, বিলিয়ে দাও ঐ গরীবদের মধ্যে। যারা বেঁচে আছে, তাদের ধারণা যে সোনাতেই সুখ।'

পাতার পর পাতা, দোয়েল পাতলা সোনা খুলে ফেলতে লাগলো —শেষ পর্যন্ত সুখী রাজপুত্রের চেহারা দেখালো ম্যাটমেটে ছাই রঙের। পাতার পর পাতা, সে বিলিয়ে দিলে সেই পাতলা সোনা গরিবদের মধ্যে। ছোটোদের মুখে লাল আভা ফিরে এলো, হাসতে-হাসতে তারা রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে খেলায় মাতলো। 'খেয়েছি! পেট ভরে খেয়েছি!' এই কথা ব'লে চ্যাঁচাতে লাগলো তারা।

তারপর বরফ পড়া শুরু হ'লো, সঙ্গে-সঙ্গেই সব জ'মে যেতে লাগলো। রাস্তাগুলো এমন শাদা আর চকচকে যেন রুপোর তৈরি, কাচের তলোয়ারের মতো লম্বা-লম্বা বরফের পাত বাড়িগুলোর চাল থেকে ঝুলে আছে। ফারের জামা আর লাল টুপি প'রে ছোটো ছেলেরা বরফের উপর স্কেটিং শুরু ক'রে দিয়েছে।

বেচারা দোয়েল! দিন-দিন সে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, আরো ঠাণ্ডা, কিন্তু রাজপুত্রকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না, তাকে সে বড্ড ভালোবাসে। রুটিওলার দরজা থেকে লুকিয়ে সে রুটির গুঁড়ো কুড়িয়ে নেয়, আর পাখা ঝাপটিয়ে-ঝাপটিয়ে শরীর গরম রাখবার চেষ্টা করে।

শেষটায় সে বুঝতে পারলে যে সে মরতে বসেছে। যেটুকু শক্তি তার বাকি ছিলো সব জড়ো ক'রে আরো একবার রাজপুত্রের কাঁধে সে চ'ড়ে বসলো। 'এবার তবে আমাকে বিদায় দাও।'

'এতদিনে মিশরদেশে যাচ্ছো তাহ'লে—খুব খুশি হলাম। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।'

দোয়েল বললে : 'আমি যেখানে যাচ্ছি সে মিশরদেশে নয়। আমি যাচ্ছি মৃত্যুর দেশে। মৃত্যু তো ঘুমেরই ভাই—নয় কি?' এই ব'লে সে ম'রে প'ড়ে গেলো রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

এই সময়ে মূর্তিটার ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুলো, যেন কিছু ফেটে ভেঙে গেলো। আর সত্যি-সত্যি সেই সীসের হৃদয় ভেঙে গেল ঠিক দু'টুকরো হ'য়ে। সত্যি ভয়ানক বরফ পড়া বটে!

পরের দিন খুব ভোরে মেয়র সাহেব কাউন্সিলরদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন পার্কে। উঁচু থামটার ধার দিয়ে যেতে-যেতে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন : 'আহা! আমাদের সুখী রাজপুত্রের এমন বিশ্রী চেহারা কেন?'

'সত্যি, কী বিশ্রী!' কাউন্সিলররা একসঙ্গে ব'লে উঠলেন। মেয়র সাহেব যা বলতেন, তাঁরা সবাই সব সময়ে তক্ষুনি সায় দিতেন তাতে। তারপর তাঁরা দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কী। মেয়র সাহেব বললেন, 'তলোয়ার থেকে চুনি গেছে, চোখ থেকে নীলা

গেছে—এখন আর ও মোটে সোনারই নয়। সত্যি বলতে, রাস্তার ভিখিরির প্রায় কাছাকাছি।'

'ভিখিরির কাছাকাছি!' কাউন্সিলররা ব'লে উঠলেন।

'আরে, পায়ের কাছে মরা একটা পাখিও যে! নাঃ, একটা আইন জারি করতে হবে যে কোনো পাখি এখানে মরতে পারবে না।' সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কেরানি কথাটা টুকে নিলে।

তারপর সুখী রাজপুত্রের মূর্তিকে টেনে নামিয়ে ফেলা হ'লো। 'রাজপুত্র এখন আর সুন্দর নন, কাজেই তাঁকে দিয়ে আর দরকার নেই,' বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক।

তারপর সেই মূর্তিকে একটা হাপরে গলানো হ'লো। মেয়র সাহেব এক সভা ডাকলেন ঐ গলানো ধাতু নিয়ে কী করা হবে তার মীমাংসা করতে। 'আর-একটা মূর্তি হবে অবিশ্যি,' মেয়র বললেন, 'আর সে-মূর্তি হবে আমার।'

'আমার!' কাউন্সিলররা প্রত্যেকে তক্ষুনি ব'লে উঠলেন, আর সে নিয়ে ঝগড়া বাধলো। শেষ যখন আমি তাঁদের কথা শুনেছিলুম, তখনো এ নিয়ে ঝগড়া করছিলেন তাঁরা।

কারখানার ম্যানেজর আর মজুররা ব'লে উঠলো: 'এ তো আশ্চর্য! এই সীসের ভাঙা হৃৎপিণ্ডটা কিছুতেই গলছে না। ওটাকে ফেলে দিতে হবে।' দিলে ওরা সেটাকে ফেলে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে, সেখানে মরা দোয়েলটাও ছিলো।

ঈশ্বর তাঁর এক দেবদূতকে বললেন: 'ঐ শহরের মধ্যে সবচেয়ে দামি যে-দুটি জিনিস তা আমাকে এনে দাও!' আর দেবদূত তাঁকে এনে দিলে সেই সীসের হৃৎপিণ্ড আর সেই মরা পাখি।

'দুটি ঠিক জিনিস এনেছো তুমি,' বললেন ঈশ্বর। 'আমার স্বর্গের বাগানে এই ছোট্ট পাখি চিরকাল ধ'রে গান করবে, আর আমার সোনার প্রাসাদে হবে সুখী রাজপুত্রের বাসা।'

অনুগত বন্ধু



সেদিন সকালবেলায় বুড়ো ইঁদুরমশাই গর্ত থেকে মাথা বের ক'রে উঁকি দিয়েছেন। চকচকে ছোটো তাঁর চোখ আর ছাই রঙের শক্ত গোঁফ, আর তাঁর লেজ লম্বা এক টুকরো কালো রবারের মতো। বাচ্চা হাঁসগুলি পুকুরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, আর তাদের মা—তার রঙ ধবধবে শাদা আর পা দুটি টুকটুকে লাল—জলের উপর মাথা রেখে কেমন ক'রে দাঁড়াতে হয় তারই কায়দা শেখাচ্ছে তাদের।

'মাথার উপর দাঁড়াতে না-পারলে ভালো সমাজে কখনোই মিশতে পাবিনে তোরা,' মা কেবলই এ-কথা বলছে, আর মাঝে-মাঝে নিজে মাথার উপর দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছে। কিন্তু বাচ্চারা তার দিকে বিশেষ মন দিচ্ছে না। তারা এতই ছোটো যে ভালো সমাজে মেশবার সুবিধেটা যে কী তা-ই তারা জানে না।

'কী অবাধ্য ছেলেপুলে বাপু,' বুড়ো ইঁদুর ব'লে উঠলো। 'ডুবে মরাই ওদের উচিত।

মা-হাঁস তক্ষুনি ব'লে উঠলো : 'বললেই হ'লো কিনা! সব জিনিসই শিখতে হয়, আর মা-বাপের ধৈর্য না থাকলে চলে!'

বুড়ো ইঁদুর বললে : 'মা-বাপের মনের কথা আমি কোত্থেকে জানবো, আমি তো বাপু ছা-পোষা লোক নই। বিয়ে আমি করিনি, কখনো করবোও না। বৌয়ের সঙ্গে কেবলই ঝকমারি—সত্যিকার বন্ধুতা যদি কারো সঙ্গে হয়, সেটা ঢের উঁচু দরের জিনিস।'

'সত্যিকারের বন্ধু আপনি কাকে বলবেন?' কথাটা বললে এক দোয়েল, সে কাছেই একটা গাছের ডালে ব'সে সব কথাবার্তা শুনছিলো।

'ঠিক! ঠিক!' মা-হাঁস ব'লে উঠলো, 'এই কথাটাই আমি

জানতে চাই।' ব'লে সে সাঁতরে চ'লে গেলো পুকুরের অন্য পাড়ে, তারপর নিজেই মাথার উপর দাঁড়িয়ে রইলো, যাতে তাকে দেখে বাচ্চারা শিখতে পারে।

'বোকার মতো কথা বোলো না,' বললে বুড়ো ইঁদুর। 'সত্যিকার বন্ধু যে, সে নিতান্তই আমার অনুগত হবে—তাছাড়া আবার কী ?'

একটা রুপোলী ফুলে ভরা ডালের উপর নেচে-নেচে, ছোট্ট তুটি পাখা ঝাপটে বললে দোয়েল : 'আর আপনি প্রতিদানে কী করবেন ?'

'কী যে বলো বুঝতে পারিনে।'

'আচ্ছা, তাহ'লে এ-বিষয়ে একটা গল্প শুনুন,' বললে দোয়েল।

বুড়ো ইঁতুর বললে : 'গল্পটা কি আমাকে নিয়ে ? তবে নিশ্চয়ই শুনবো—আমি গল্প-টল্প খুব ভালোবাসি কিনা।'

'আপনার সম্বন্ধে গল্পটা খাটে বইকি,' ব'লে দোয়েল নামলো নিচে, পাড়ে ব'সে অনুগত বন্ধুর গল্প বললে।

দোয়েল আরম্ভ করলে : 'এক ছিলো হান্স। দেখতে সে ছোট্ট, আর খুব ভালোমানুষ।'

'নামজাদা কেউ নাকি ?' বুড়ো ইঁতুর জিগগেস করলে।

'না, নামজাদা মোটেও নয়,' দোয়েল বলতে লাগলো, 'এক যদি ভালোমানুষির জন্য তার নাম থাকে, সে আলাদা কথা। মুখখানা তার গোলগাল আমুদে গোছের—দেখলে হাসিই পায়। থাকে সে একেবারে একলা এক ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে, আর রোজ কাজ করে তার বাগানে। এত সুন্দর বাগান ও-দেশে আর কারো ছিলো না। মাসে-মাসে ঋতুতে-ঋতুতে কত রকমের রাশি-রাশি ফুল ফুটতো সেখানে। যখনই যাও না, রঙের ছড়াছড়ি সেখানে, হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধের কাড়াকাড়ি।

'ছোট্ট হান্সের অনেক বন্ধু ছিলো, তার মধ্যে সবচেয়ে যে অনুগত তার নাম হিউ। হিউর ছিলো ময়দার কল, অবস্থা বেশ ভালো। এই হিউ ছোট্ট হান্সের এতই অনুগত ছিলো যে ওর বাগানের ধার দিয়ে যখনই সে যেতো, তখনই দেয়ালের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতো মস্ত এক ঝুড়ি ফুল, আর সেটা ফলের সময়ে হ'লে, পকেট ভ'রে নিতো প্লম পীচ চেরি যা পেতো হাতের কাছে।

'"আলাদা ব'লে কারো কিছু থাকবে না—সত্যিকার বন্ধুতা মানেই তো এই।" ময়দাওলা সব সময় এ-কথা বলতো, আর হান্স সায় দিতো মাথা নেড়ে। এত সব বড়ো-বড়ো কথা যার মাথায়, তাকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছে ভাবতে গর্বই হ'তো তার।

'পাড়া-পড়শিদের অবশ্যি এটা একটু অদ্ভুত ঠেকতো যে ময়দাওয়ালা প্রতিদানে হান্সকে কোনোদিনই কিছু দেয় না, যদিও তার তিনশো বস্তা ময়দা আছে কারখানায় মজুত, আছে ছ'টা ভালো-ভালো গাই আর মস্ত এক পাল ভেড়া। কিন্তু হান্স এ নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাতো না; ময়দাওলা তাকে নিঃস্বার্থ ও প্রকৃত বন্ধুতা সম্বন্ধে যে-সব বড়ো-বড়ো কথা বলতো তা শুনেই খুশি থাকতো সে।

'হান্স তো বাগানে কাজ ক'রেই সময় কাটায়। বসন্তকালে কি গ্রীষ্মে কি হেমন্তে হান্স বেশ ফুর্তিতে থাকতো, কিন্তু শীত এলেই তার কষ্টের শুরু। তখন তার বাগানে না ফুটতো ফুল না ধরতো ফল—বাজারে নিয়ে সে বেচবে কী? শীতে আর অনাহারে বেজায় কষ্ট হ'তো তার; কোনোদিন হয়তো দুটো শুকনো বাদাম ছাড়া আর কিছুই জুটতো না। তা ছাড়া,

শীতকালে তার বড়ো একা-একাও লাগতো, কারণ তখন ময়দা-ওলা একবারও তার বাড়িতে আসতো না।

'ময়দাওলা তার বৌয়ের কাছে বলে : "ছোট্ট হান্সের বাড়িতে আমার যাওয়ার কোনো মানে হয় না—যদ্দিন বরফ পড়ার শেষ না হয়। লোকে যখন দুঃখে-কষ্টে থাকে, তখন একা থাকাই ভালো ; লোকজন গেলেই উৎপাত। আমার তো বন্ধুতা সম্বন্ধে এই ধারণা, আর এই ধারণা নিশ্চয়ই সত্যি। শীতটা কেটে যাক, তারপর বসন্ত এলেই আমি যাবো ওর কাছে। ও তখন আমাকে ঝুড়ি ভ'রে গোলাপফুল দিতে পেরে কতই না খুশি হবে।"

'মস্ত গনগনে আগুনের সামনে ইজিচেয়ারে আরাম ক'রে ব'সে বৌ জবাব দিলে : "সত্যি পরের উপর তোমার এত দরদ। বন্ধুতার কথা তুমি যখন বলো—সেটা শোনবার মতো বটে।"

'এমন সময় ময়দাওলার ছোটো ছেলে ব'লে উঠলো : "আচ্ছা, হান্সকে তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেই হয়। ও যদি কষ্টে প'ড়ে থাকে আমি ওকে আমার খাবার থেকে অর্ধেক দেবো, তাহ'লেই হবে।"

'ময়দাওলা ব'লে উঠলো : "দূর বোকা ছেলে ! তোকে ইস্কুলে পাঠিয়ে যে কী লাভ হচ্ছে তা জানিনে। জ্ঞানগম্যি কিছুই তো হয়নি। কী আশ্চর্য, হান্স যদি এখানে এসে দেখে এত প্রচুর খাবার-দাবার আর এমন গনগনে আগুন জ্বলছে ঘরে, তবে কি ওর হিংসে হবে না ! আর হিংসে জিনিসটা অতি বিশ্রী, তাতে যে-কোনো লোকের স্বভাব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি কখনোই সেটা বরদাস্ত করবো না। ওর প্রকৃত বন্ধু এক আমিই তো ; আমি সব সময় ওর উপর নজর রাখবো, যাতে কোনো লোভ

ওর মনে না ঢোকে। তাছাড়া, হান্স এখানে এলে হয়তো কিছু ময়দা ধারে চাইতে পারে, কিন্তু ধারে দিতে তো আমি পারবো না। ময়দা এক জিনিস আর বন্ধুতা আর-এক জিনিস, দুটো গুলিয়ে ফেলা কিছু কাজের কথা নয়। আরে, কথা দুটোর বানান পর্যন্ত আলাদা, মানে আলাদা হবে না! এ সোজা কথাটা কে না বোঝে!"

'"কী চমৎকার তুমি কথা বলো," বললে ময়দাওলার বৌ। "শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে গেছে।"

'ময়দাওলা বললে: "ভালো কাজ তো অনেকেই করে, কিন্তু কথা ভালো বলে ক'জন! এতেই বোঝা যায় যে দুটোর মধ্যে কথা বলাটাই হচ্ছে ঢের বেশি শক্ত—আর অনেক উঁচু দরের ব্যাপারও বটে।" এই ব'লে সে এমন কটমট ক'রে ছোটো ছেলেটার দিকে তাকালো যে বেচারা লজ্জায় লাল হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে তার চায়ের বাটির মধ্যে কেঁদেই ফেললে। যাকগে, ও ছেলেমানুষ, ওর কোনো দোষ ধরো না।'

'এই নাকি গল্পের শেষ?' জিগগেস করলে বুড়ো ইঁদুর।

'শেষ!' দোয়েল বলে উঠলো, 'এই তো মোটে আরম্ভ।'

'ও, আরম্ভ! বেশ, বেশ, ব'লে যাও, তোমার ঐ ময়দাওলাটি ভারি চমৎকার। ওর সঙ্গে আমার খুব মেলে, এ-ধরনের বড়ো-বড়ো কথা আমিও প্রায়ই ভাবি কিনা।'

দোয়েল বলতে লাগলো, 'তারপর হ'লো কী, যেই শীত শেষ হ'লো আর প্রথম গোলাপগুলো হলদে তারার মতো ফুটতে লাগলো, তখনি ময়দাওলা তার বৌকে বললে যে এবার সে যাবে হান্সের খোঁজ-খবর নিতে।

'বৌ ব'লে উঠলো, "সত্যি, তোমার মতো ভালো লোক আর হয়

না। পরের কিসে ভালো হবে এ ছাড়া তোমার চিন্তাই নেই। আর শোনো, ফুল আনবার জন্য আমাদের বড়ো ঝুড়িটা নিয়ে যেয়ো কিন্তু।"

'বড়ো ঝুড়িটা বগলদাবা ক'রে ময়দাওলা বেরুলো রাস্তায়। হান্সের বাড়ির কাছে গিয়ে বললে, "এই যে হান্স, ভালো তো ?"

'"তুমি কেমন আছো ?" হাতের কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হান্স বললে। তার মুখের হাসি হু'কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

'"কেমন কাটলো শীতটা ?" ময়দাওলা জিগগেস করলে।

'হান্স জবাব দিলে, "ভাই, তুমি খোঁজ-খবর নাও ব'লেই বলছি, শীতটা মোটেই ভালো কাটেনি। যাকগে, এখন বসন্ত এসেছে, এখন বেশ ভালোই যাচ্ছে। আমার ফুলগুলো ফুটেছে বেশ।"

'ময়দাওলা বললে, "শীতকালে তোমার বিষয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে, কেমন আছো না জানি !"

'"আহা—বড্ড ভালো তুমি ! আমি আরো ভাবছিলাম আমাকে বুঝি ভুলেই গেলে।"

'ময়দাওলা ব'লে উঠলো : "হান্স, তোমার কথা শুনে অবাক হলুম। বন্ধু কি কখনো ভোলে ! বন্ধুতার মূল কথাই তো এই যে—তা তুমি এ-সব কবিত্ব ভালো বোঝো ব'লে মনে হয় না। এবার তোমার গোলাপগুলো বেশ ফুটেছে।"

'"হ্যাঁ, ভারি সুন্দর। এতগুলো ফুটেছে ব'লেই রক্ষে। আমি এগুলো তুলে নিয়ে বাজারে যাবো, তারপর বিক্রি ক'রে যা পয়সা হবে তা দিয়ে আমার ঠেলাগাড়িটা ছাড়িয়ে আনবো।'

'"ছাড়িয়ে আনবে মানে ? তুমি ওটা বাঁধা রেখেছিলে নাকি ? বোকা আর কাকে বলে !"

'হান্স বললে, "সত্যি ভাই, আমার যে আর উপায় ছিলো না।

দ্যাখো, শীতকালটা আমার বড়ো কষ্টে গেছে। একটা পয়সা ছিলো না হাতে। প্রথমে আমার জামা থেকে রুপোর বোতাম খুলে বেচলুম ; তারপর বেচলুম ঘড়ির চেন ; তারপর ঠেলাগাড়িটা বাঁধা রাখতে হ'লো। যাকগে, এখন আমার হাতে টাকা হবে, সবই আবার ফিরিয়ে আনবো।"

'ময়দাওলা বললে, "হান্স, কিছু ভেবো না, তোমাকে আমার ঠেলাটা দিয়ে দেব। ঠেলাটা অবশ্যি একটু নড়বড়ে—একটা দিক আসলে ভেঙেই গেছে, ভালো ক'রে চলেও না, কিন্তু তবু সেটা আমি তোমাকে দেবো। জানি, এটা আমার উদারতার বাড়াবাড়ি হচ্ছে, অনেকেই ভাববে আমি ঠেলাটা হাতছাড়া ক'রে ভয়ানক বোকামি করছি—কিন্তু আমি তো ভাই পৃথিবীর অন্য সব লোকের মতো নই। আমার মতে উদারতাই হচ্ছে বন্ধুতার সার—তা ছাড়া, আমার নিজের একটা নতুন জাঁতা আছে। কিছু ভেবো না তুমি, আমার ঠেলাটা দেবো তোমাকে।"

'"বড্ড উপকার করলে আমার," বলতে-বলতে হান্সের গোল-গাল মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, "একটু মেরামত ক'রে নিলেই হবে, আমার কাছে এক টুকরো কাঠও আছে।"

'"কাঠ আছে নাকি?" ময়দাওলা ব'লে উঠলো, "ঠিক আমার যা দরকার। আমার গোলাঘরের ছাদটা ফুটো হ'য়ে গেছে, সেটা না-সারালে ধান-টান সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। ভাগ্যিস তুমি কথাটা বলেছিলে! দেখলে তো, উপকার করলেই উপকার পাওয়া যায়। আমার ঠেলাগাড়ি দিয়েছি তোমাকে, এখন তুমি যে ঐ কাঠটুকু আমাকে দেবে, সে তো জানা কথা। অবিশ্যি ঐ এক টুকরো কাঠের চাইতে ঠেলাগাড়ির দাম ঢের বেশি, তা সত্যিকার বন্ধুতা এ-সব লক্ষ্যই করে না! ওটা এখনই নিয়ে

এসো, আজ থেকেই আমার গোলাঘরের কাজ আরম্ভ ক'রে দিই।"

'"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," ব'লে হান্স এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে কাঠের টুকরো টেনে বার করলে।

'"তক্তাটা তেমন বড়ো নয় দেখছি," বললে ময়দাওলা, "আমার চালের ফুটো সারিয়ে তোমার ঠেলাগাড়ি সারাবার মতো কাঠ থাকলে হয়। যাক, সে তো আর আমার দোষ নয়। হ্যাঁ, ঠেলাটা তোমাকে দিলুম তো—তার বদলে এই ঝুড়ি ভ'রে ফুল তো তুমি দেবেই, কী বলো? এই নাও ঝুড়ি, একেবারে ভ'রে দিও কিন্তু।"

'"একেবারে ভ'রে?" হান্সের মনটা একটু খারাপ হ'য়ে গেলো। ঝুড়িটা প্রকাণ্ড, একেবারে ভরতে গেলে বাজারে বেচবার মতো কিছু বাকি থাকবে না। এদিকে রুপোর বোতামগুলো কবে ফিরিয়ে আনবে তাই সে ভাবছে।

'ময়দাওলা বললে, "তোমাকে আস্ত একটা ঠেলাগাড়ি দিলুম, তার কাছে কয়েকটা ফুল এমন কী? আমার হয়তো এটা বোঝবার ভুল, কিন্তু আমার তো বিশ্বাস সত্যিকার বন্ধুতায় কোনোরকম স্বার্থপরতার নামগন্ধও নেই।"

'হান্স ব'লে উঠলো, "তুমি আমার এতদিনের বন্ধু, তুমি আমার এত বড়ো বন্ধু—আমার বাগানের সমস্ত ফুল তুমি নিয়ে গেলেই বা কী! তুমি যে আমাকে বন্ধু ব'লে ভাবো, আমার রুপোর বোতামের চাইতে তার দাম অনেক বেশি।" এই ব'লে হান্স তার বাগানের সবগুলো গোলাপ তুলে ময়দাওলার ঝুড়ি ভ'রে দিলে।

'"আচ্ছা, আজ তাহ'লে চলি," ব'লে ময়দাওলা সেই কাঠের ফালি কাঁধে ফেলে আর ফুলের ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি

ফিরলো। ছোট্ট হান্স খুব ফুর্তিতে আবার মাটি কোপাতে শুরু করলে—ঠেলাগাড়ির কথা শুনে মনই তার ভালো হ'য়ে গিয়েছিলো।

পরের দিন সে তার ঘরের চালে একটা লতা তুলে দিচ্ছে এমন সময় সে শুনলে ময়দাওলা তাকে রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে ডাকছে। লাফিয়ে নামলো সে মই থেকে, ছুটে গিয়ে বাগানের বেড়ার উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, ময়দাওলা পিঠে এক বস্তা নিয়ে আসছে।

'"ভাই হান্স," ময়দাওলা খুব নরম গলায় বললে, "আমার এই ময়দার বস্তাটা তুমি বাজারে পৌঁছে দিয়ে এসো না।"

'"ভাই আজ তো আমার অনেক কাজ আছে, কিছু মনে কোরো না। এই ছ্যাখো না সব লতাগুলোকে তুলে দিচ্ছি, তারপরে ফুলে জল দিতে হবে, তারপর ঘাস ছাঁটতে হবে।"

'"ছ্যাখো, তোমাকে আমি আমার ঠেলাটা দিয়ে দিলুম, আর তুমি না বললে কেমন ক'রে? এ কি বন্ধুর কাজ?"

'"ছী ছি, ও-কথা বোলো না," হান্স ব'লে উঠলো। "তোমার বন্ধুতার খাতিরে কিছুই নেই যা আমি না করতে পারি।" ব'লে সে এক ছুটে গিয়ে তার টুপি নিয়ে এলো, বেরিয়ে পড়লো মস্ত বস্তাটা ঘাড়ে ক'রে।

'বেজায় গরম, রাস্তায় ভয়ানক ধুলো। খানিকদূর হেঁটেই হান্স হাঁপিয়ে পড়লো। তবু কষ্ট ক'রে হেঁটে-হেঁটে শেষ পর্যন্ত সে পৌঁছলো বাজারে। সেখানে খানিকক্ষণ ব'সে থেকে ময়দার বস্তাটা খুব ভালো দামে বেচলে সে, তক্ষুনি আবার বাড়ির পথ ধরলো, পাছে সন্ধে হ'য়ে গেলে রাস্তায় ডাকাতে ধরে।

'"ওঃ, খুব খেটেছি আজ," রাত্রে বিছানায় শুয়ে হান্স মনে-মনে বললে, "যাক, ময়দাওলার কথাটা রেখে ভালোই করেছি; ওর

মতো বন্ধু আমার আর নেই, ওর ঠেলাটা দিয়ে দিচ্ছে তো আমাকে।”

‘পরের দিন খুব ভোরে ময়দাওলা এলো ময়দা-বেচা টাকা নিতে। হান্স খুব ক্লান্ত হয়েছিলো কিনা, তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি।

‘“এ কী!” ময়দাওয়ালা চেঁচিয়ে হাঁক দিলে। “এখনো ওঠোনি! তুমি তো বড্ড কুড়ে দেখছি। তোমাকে আমার ঠেলাটা দিয়ে দিচ্ছি, এ-কথা ভেবেও তো একটু বেশি খাটতে পারো। অলসতা হচ্ছে মহাপাপ—আমার কোনো বন্ধু কুড়ে হবে কি ঢিল দেবে এ আমি একেবারেই পছন্দ করিনে। তোমাকে মন খুলেই বলছি, কিছু মনে কোরো না। তবে তুমি আমার বন্ধু না হ’লে তো এ-সব কথা বলতুম না। মন খুলে কথা কইতে না-পারলে বন্ধুতা কিসের? মন-গলানো মিষ্টি কথা সকলেই তো বলতে পারে; কড়া কথা বলতে এক বন্ধুই পারে, মনে কষ্ট দিতেও পরোয়া করে না। আরে সত্যিকারের বন্ধু তো মিঠে কথা না-ব’লে কড়া কথাই বলবে, কারণ তাতেই মঙ্গল।”

‘“কিছু মনে কোরো না ভাই,” চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে ব’সে, হান্স বললে। “আমার এত ক্লান্ত লাগছিলো যে শুয়ে শুয়ে একটু পাখির গান শুনছিলুম। জানো, পাখির গান শোনবার পরে আমার কাজে উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়।”

‘“শুনে খুশি হলুম,” হান্সের পিঠ চাপড়ে বললে ময়দাওলা, “শিগগির তবে তৈরি হ’য়ে নাও, আজ আমার গোলাঘরের চালটা সারিয়ে দেবে।”

‘বেচারা হান্স! দু’দিন তার ফুলে জল দেয়া হয়নি, এখন সে তার বাগানে গিয়ে কাজ করতে পারলে বাঁচে, কিন্তু ময়দাওলা তার এত বড়ো বন্ধু, তাকেই বা কী ক’রে ফেরায়?

'খুব ভয়ে-ভয়ে সে জিগগেস করলে, "যদি বলি আজ আমার অনেক কাজ আছে তবে কি খুব চটবে ?"

'"আমি তো তোমার কাছে খুব বেশি কিছু চাচ্ছিনা," ময়দাওলা গম্ভীরভাবে জবাব দিলে। "তোমাকে আমার ঠেলাটা তো দিয়েছি। অবিশ্যি তোমার যদি মত না হয় আমি নিজেই কাজটুকু ক'রে ফেলবো।"

'"পাগল! তা কি হয়!" ব'লে সে লাফিয়ে নামলো বিছানা থেকে, তৈরি হ'য়ে নিলো, তারপর ময়দাওলার গোলাঘরে সেই সকাল থেকে সারাদিন সে কাজ করলে, যতক্ষণ সূর্য না ডুবলো। সূর্য যখন ডুবলো, ময়দাওলা এলো কাজ দেখতে। এসে খুব ফুর্তির স্বরে বললে, "কী হে হান্স, তোমার কাজ শেষ হ'লো ?"

'মই থেকে নেমে আসতে-আসতে হান্স বললে, "হ্যাঁ, তোমার চাল ঠিক মেরামত হয়েছে—ছ্যাখো।"

'ময়দাওলা বললে, "বাঃ বেশ। সত্যি, পরের জন্যে আমরা যে কাজ করি তার মতো আনন্দের আর কিছুই নয়।"

'কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে হান্স বললে, "তোমার এ-সব কথা শুনতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা। কিন্তু এ-সব উঁচু-দরের ভাব আমার মনে তো কখনো আসে না।"

'"আসবে, আসবে। একটু ধৈর্য দরকার, কষ্ট না-করলে কি ও-সব আসে? বন্ধুতা জিনিসটা এখন তুমি কাজে খাটাচ্ছো মাত্র, একদিন বন্ধুতার আদর্শটাও বুঝতে পারবে।"

'"সত্যি কি বুঝতে পারবো কোনোদিন ?"

'"নিশ্চয় পারবে। তা চাল মেরামত ক'রে ক্লান্ত হয়েছো নিশ্চয়ই; এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোও, কাল ভোরে উঠেই তো আমার ভেড়ার পাল চরাতে বেরুবে।"

'বেচারা হান্স-এর মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস হ'লো না। পরের দিন খুব ভোরে ময়দাওলা ঠিক তার ভেড়ার পাল নিয়ে এসে হাজির। হান্স আর কী করে, বেরুলো ভেড়া চরাতে, সারাদিন ঘুরে-ঘুরে এত ক্লান্ত হ'লো যে বাড়ি ফিরে চেয়ারে ব'সেই ঘুমিয়ে পড়লো।

'পরের দিন তার ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। "আঃ আজকের দিনটা বাগানে কাজ ক'রে চমৎকার কাটবে," মনে-মনে বললে সে।

'কিন্তু বাগানের দেখাশোনা করা কোনোরকমেই তার হয়ে উঠলো না। তার বন্ধু ময়দাওলা যখন-তখন এসে তাকে নানারকম কাজে পাঠাচ্ছে, নয়তো তাকে নিয়ে যাচ্ছে তার ময়দার কলে কাজ করতে। ছোট্ট হান্সের এক-এক সময় বড়ো মন-খারাপ লাগে, তার ফুলেরা বুঝি আদর-যত্ন না-পেয়ে রাগ করলো—কিন্তু সে এই ব'লে নিজেকে সান্ত্বনা দিতো যে ময়দাওলার মতো বন্ধু তার আর নেই। তাছাড়া, সে আমাকে ঠেলাগাড়িটা দিয়েছে তো—এত বড়ো উপকার কে করে!

'এমনি ক'রে-ক'রে এই হ'লো যে ছোট্ট হান্স সব সময়েই ময়দাওলার জন্যে খাটছে। বন্ধুতার উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ময়দাওলা অনেক ভালো-ভালো কথা বলে, হান্স আবার সেগুলো একটা নোট-বইয়ে টুকে নেয়, তারপর রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে পড়ে। লেখা-পড়ায় তার মাথা ছিলো বেশ ভালো।

'একদিন সন্ধেবেলা হ'লো কী, হান্স ব'সে আছে তার ঘরে আগুনের ধারে, এমন সময় দরজায় দুমদাম ধাক্কা। রাতটা ঝোড়ো হ'য়ে আসছিলো, শোঁ-শোঁ ক'রে এমন জোরে হাওয়া বইছিলো ঘরের চারদিকে যে হান্স প্রথমে ভাবলে ও বুঝি হাওয়ার শব্দ।

কিন্তু শব্দটা দু'বার তিনবার যখন হ'লো তখন হান্স ভাবলে কোনো পথিক বুঝি আশ্রয় চাইছে, উঠে দরজা খুললে।

'এক হাতে লণ্ঠন, আর-এক হাতে মস্ত মোটা লাঠি নিয়ে ময়দাওলা দাঁড়িয়ে।

'ময়দাওলা বললে : "ভাই হান্স, বড়ো বিপদে পড়েছি। আমার ছোটো ছেলেটা মই থেকে প'ড়ে গিয়ে জখম হয়েছে—আমি যাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু ডাক্তার থাকে অনেক দূরে, আর রাতটা ভীষণ ঝোড়ো হ'য়ে এলো—তাই এইমাত্র আমার মনে হ'লো যে আমি না গিয়ে তুমি গেলে ঢের ভালো হয়। তোমাকে আমার ঠেলাগাড়িটা দিয়েছি, তার প্রতিদানে তুমি কিছু করবে এ তো আশাই করা যায়।"

'"নিশ্চয়ই," হান্স ব'লে উঠলো। "তুমি যে এ-জন্যে আমার কাছে এসেছো এতে আমি খুবই খুশিই হয়েছি। তোমার লণ্ঠনটা এখন আমাকে দাও—নয়তো এই অন্ধকারে আমি হয়তো পা পিছলে নালায় প'ড়ে যাবো।"

'ময়দাওলা জবাব দিলে : "আমাকে মাপ করো। লণ্ঠনটা একেবারে নতুন, এটার কিছু হ'লে বড়ো লোকশান হবে আমার।"

'"যাকগে, লণ্ঠন ছাড়াই আমার চলবে," ব'লে হান্স তার লম্বা কোট আর টুপি প'রে নিলে, গলায় জড়ালো মাফলর, তারপর বেরিয়ে পড়লো।

'উঃ কী ভীষণ ঝড়! মিশমিশে কালো অন্ধকারে হান্স কিছুই দেখতে পায় না, হাওয়ার এমন জোর যে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল। যা হোক, হান্স সাহস ক'রে চললো এগিয়ে, সমানে তিন ঘণ্টা হেঁটে ডাক্তারের বাড়ি পৌঁছিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে।

'"কে?" জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে ডাক্তার হাঁক দিলে।

'"আমি ছোট্ট হান্স।"

'"ছোট্ট হান্স, কী দরকার তোমার?"

'"ময়দাওলার ছেলে মই থেকে প'ড়ে চোট পেয়েছে, আপনাকে এক্ষুণি আসতে হবে।"

'"আচ্ছা যাচ্ছি," ব'লে ডাক্তার তাঁর মস্ত বুটজোড়া প'রে লণ্ঠন হাতে নিচে নেমে এলেন, তারপর ঘোড়ায় চ'ড়ে রওনা হলেন। ছোট্ট হান্স হাঁটতে-হাঁটতে এলো পিছনে।

'এদিকে ঝড় ক্রমেই ভয়ানক হ'য়ে উঠলো, বৃষ্টি নেমে এলো স্রোতের মতো—ছোট্ট হান্স কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারলে না, না-পারলে ঘোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে। পথ হারিয়ে মস্ত মাঠের মধ্যে এসে পড়লো সে, সেখানে ছিলো অনেক বড়ো-বড়ো নালা-নর্দমা—তারই একটায় ডুবে মরলো হান্স। তার মৃতদেহ পরের দিন কয়েকটা রাখালছেলের চোখে পড়লো, তারা তাকে নিয়ে এলো তার বাগান-ঘেরা কুঁড়েঘরে।

'হান্সকে সকলেই ভালোবাসতো, তার মৃত্যুতে শোক করলো সকলেই, সবচেয়ে বেশি শোক করলো ময়দাওলা।

'হান্সকে কবর দিতে অনেকেই গেলো। ময়দাওলা বললে, "আমি ওর সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিলুম কিনা, আমার জায়গা সকলের আগে।" এই ব'লে কালো কাপড় প'রে সে চললো সকলের আগে-আগে, আর মাঝে মাঝে মস্ত রুমাল বের ক'রে চোখ মুছতে লাগলো।

'হান্সের কবর হ'য়ে গেলো। তারপর সরাইখানায় আরাম ক'রে ব'সে ভালো-ভালো জিনিস খেতে-খেতে সবাই যখন জটলা করছে, গাঁয়ের কামার বললে, "হান্স ম'রে যাওয়ায় সকলেরই খুব ক্ষতি হ'লো।"

'ময়দাওলা তক্ষুনি ব'লে উঠলো, "আমার ক্ষতি সবচেয়ে বড়ো। আরে, আমার ভাঙা ঠেলাগাড়িটা আমি তো ওকে প্রায় দিয়েই দিয়েছিলুম, এখন ওটা নিয়ে কী করি তাই ভাবনা হয়েছে। বাড়িতে ওটা রাখবার জায়গা নেই, আর এমন অবস্থা যে বেচলে এক পয়সাও পাবো না। নাঃ, কোনোদিন আর কাউকে কিছু দেবো না। দয়া করতে গেলে হাঙ্গামাই বাড়ে দেখছি।"'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বুড়ো ইঁদুর বললে, 'তারপর ?'

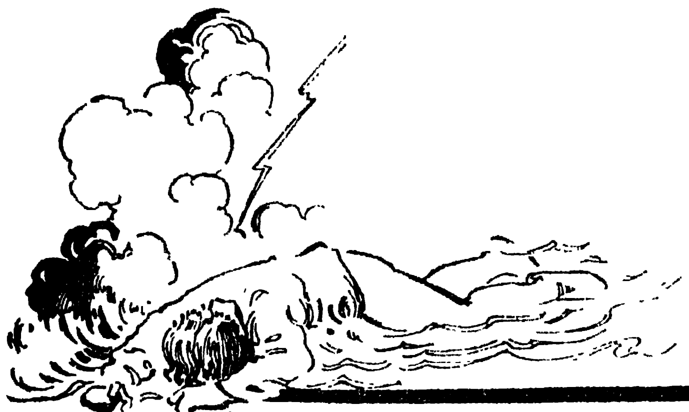
দোয়েল বললে, 'এ-ই তো শেষ।'

'কিন্তু ময়দাওলার কী হ'লো ?'

'কে জানে কি হ'লো,' দোয়েল ব'লে উঠলো। 'ব'য়ে গেছে আমার জানতে।'

'তোমার মধ্যে সহানুভূতির বড়ো অভাব দেখছি!' বললে বুড়ো ইঁদুর।

'মনে হচ্ছে গল্পের নীতিকথাটা আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি —বললে দোয়েল।



একটি লাল গোলাপ



তরুণ ছাত্রটি ব'লে উঠলো, 'সে বলেছে আমার সঙ্গে নাচবে—যদি আমি তাকে একটি লাল গোলাপ এনে দিতে পারি। কিন্তু আমার সারা বাগানে আজ লাল গোলাপের চিহ্নমাত্র নেই।'

বটগাছের ডালে তার বাসার মধ্যে ব'সে কোকিল এই কথাগুলি শুনলো। পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগলো কথাগুলোর মানে কী।

ছাত্রটি আবার বলে উঠলো, 'সারা বাগানে একটি লাল গোলাপ নেই!' বলতে-বলতে জলে ভ'রে এলো তার সুন্দর চোখ দুটি। 'হায়রে, কী সব তুচ্ছ জিনিসের উপর আমাদের সুখ নির্ভর করে! জ্ঞানীরা যা-কিছু লিখে গেছেন সব আমি পড়েছি, দর্শনশাস্ত্রের সব গূঢ় তত্ত্ব আমার দখলে—তবু কিনা একটি লাল গোলাপের অভাবে আজ আমার জীবন দুঃখময়!'

কোকিল বললে, 'এর ভালোবাসা দেখছি একেবারেই খাঁটি। রাতের পর রাত আমার গানে এর কথাই আমি বলছি, যদিও একে তখন আমি চিনতুম না; রাতের পর রাত এর কথাই আকাশের তারাকে শুনিয়েছি। এখন একে দেখতে পেলুম। এর চুলের রঙ কচুরিপানার ফুলের মতো, আর তার বাঞ্ছিত গোলাপের মতোই ঠোঁট দুটি লাল। কিন্তু এখন অধীর ব্যাকুলতায় তার মুখ হয়েছে হাতির দাঁতের মতো ম্লান, আর তার কপালে দুঃখ তার নিজের চিহ্ন স্পষ্ট ক'রে এঁকে দিয়েছে।'

ছাত্রটি মৃদুস্বরে বললে, 'রাজপুত্রের প্রাসাদে কাল নাচের উৎসব, সে-উৎসবে সেই মেয়েও যোগ দেবে যাকে আমি মনে-মনে ভালোবাসি। যদি তাকে একটি লাল গোলাপ এনে দিতে পারি, তাহ'লে সে আমার সঙ্গেই নাচবে বার-বার, যতক্ষণ ভোর

না হয়। যদি লাল একটি গোলাপ তাকে দিতে পারি, তাহ'লে তার হাত দুটি আমি ধরতে পারবো, আর সে তার মাথাটি আমার কাঁধের উপর রাখবে। কিন্তু আমার বাগানে তো আজ একটিও লাল গোলাপ নেই, তাই আমি একা-একা চুপচাপ ব'সে থাকবো, আর সে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। সে আমাকে লক্ষ্যই করবে না, আর কষ্টে আমার বুক যাবে ভেঙে।'

'আহা—এ তো দেখছি সত্যিই ভালোবাসে,' বললে কোকিল। 'আমার গলায় যা গান হ'য়ে ফোটে, ওর প্রাণে তা বেঁধে দুঃখ হ'য়ে। আমার কাছে যা আনন্দ সেটা ওর যন্ত্রণা। ভালোবাসার মতো আশ্চর্য আর কী আছে? হীরে-পান্নার চেয়েও তা মূল্যবান। মুক্তো দিয়ে কি মৃগনাভি দিয়ে তা কেনা যায় না, বাজারেও তার লেনদেন নেই। সওদাগরেরা এ নিয়ে ব্যবসা করে না, সোনার ওজনে একে দাঁড়িপাল্লায় চড়ানো—তাও অসম্ভব।'

তরুণ ছাত্রটি বললে, 'নানারকম যন্ত্র নিয়ে বাজিয়েরা সারে-সারে বসবে—বাজবে বাঁশি, বাজবে বেহালা, আর সেই মেয়ে তালে-তালে নাচবে। এত হালকা তার নাচের ভঙ্গি যে তার পা যেন মেঝেতে ঠেকবেই না, আর রাজপুত্রের যত অতিথি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াবে—কী সুন্দর তাদের পোশাক! কিন্তু আমার সঙ্গে সে নাচবে না, কারণ তাকে দেবার মতো একটি লাল গোলাপও আমার নেই।'

এই ব'লে সেই যুবক ঘাসের উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।

ছোট্ট সবুজ একটা টিকটিকি লেজ উঁচু ক'রে তার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে-যেতে বললে, 'এ লোকটা কাঁদছে কেন?'

একটা প্রজাপতি রোদের একটি রেখাকে ঘিরে ফুরফুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, সে বললে, 'কে জানে কেন।'

'কে জানে কেন,' একটি চাঁপা ফুল নিচু গলায় তার পাশের ফুলটিকে বললে।

কোকিল বললে, 'একটি লাল গোলাপের জন্য সে কাঁদছে।'

'একটা লাল গোলাপের জন্যে! এমন মজার কথা কে কবে শুনেছে!' ব'লে টিকটিকি উঠলো হেসে।

কিন্তু যুবকের প্রাণের ব্যথা কোকিল বুঝলে। বটগাছের ডালে চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে সে ভাবতে লাগলো ভালোবাসার মতো এত বড়ো রহস্য বুঝি আর-কিছু নেই।

হঠাৎ সে তার কালো পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেলো। ছায়ার মতো সে বন-বীথিকা পার হ'লো, ছায়ার মতো উড়ে চ'লে এলো বনভূমি পার হ'য়ে।

একটি ঘাসের জমির মাঝখানে সুন্দর গোলাপ গাছটি দাঁড়িয়ে। কোকিল উড়ে এসে তারই একটি ডালের উপর বসলো।

'তোমার একটি লাল গোলাপ আমাকে দেবে?' কোকিল বললে। 'তাহ'লে আমার সবচেয়ে মধুর গান তোমাকে শোনাব।'

কিন্তু গোলাপ গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপেরা সব শাদা। সমুদ্রের ফেনার মতো শাদা, পাহাড়ের চুড়োয় যে-তুষার জ'মে থাকে তার চেয়েও শাদা। কিন্তু ঐ দিকে আমার এক বোন আছে, তার কাছে যাও, তুমি যা চাও সে হয়তো তোমাকে তা দিতে পারবে।'

কোকিল উড়ে গিয়ে বসলো, পাশের গোলাপগাছটিতে।

'আমাকে একটি লাল গোলাপ যদি দাও, তা'হলে আমার সব চেয়ে মধুর গান তোমাকে শোনাবো।'

গোলাপগাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার ফুলেরা সব হলদে, জল-কন্যার চুলের মতো হলদে, ঐ মাঠে যে-সূর্যমুখী ফুল ফুটে থাকে তার চেয়েও হলদে। কিন্তু যুবকের জানলার তলায় আছে আমার এক বোন, তার কাছে যাও, সে বোধহয় দিতে পারবে তুমি যা চাও।'

কোকিল তখন যুবকের জানলার তলায় গোলাপগাছটির উপরে গিয়ে বসলো।

'আমাকে একটি লাল গোলাপ যদি দাও, আমার সবচেয়ে মধুর গান তোমাকে শোনাবো।'

কিন্তু গোলাপগাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপগুলি লাল, পায়রার পায়ের মতো লাল, সমুদ্রের গহ্বরে যত প্রবাল-স্তূপ থেকে-থেকে কেঁপে ওঠে, আমার গোলাপ তার চেয়েও লাল। কিন্তু শীতে আমার রক্ত জ'মে গেছে, তুষার আমার কুঁড়িগুলিকে মেরেছে, ঝড় এসে ভেঙেছে আমার ডাল, এ-বছর আমি আর একটিও গোলাপ ফোটাতে পারবো না।'

কোকিল ব'লে উঠলো, 'একটি! একটি লাল গোলাপই আমি চাই! এমন কোনো উপায় কি নেই যাতে তা পাওয়া সম্ভব?'

'আছে উপায়,' গাছ জবাব দিলে। 'কিন্তু তা এমনই ভয়ানক যে তা বলতেও আমার সাহস হয় না।'

'বলো, আমাকে বলো! আমি ভয় পাবো না। বলো!'

গোলাপগাছ বললে, 'তবে শোনো। সত্যি যদি তুমি লাল গোলাপ চাও সে-গোলাপ তোমাকেই তৈরি করতে হবে চাঁদের আলোয় গান গেয়ে, তোমাকেই রাঙাতে হবে আপন বুকের রক্তে। আমার কাঁটায় বুক ঠেকিয়ে তুমি গান গাইবে, সারা রাত ধ'রে আমাকে তুমি গান শোনাবে। আমার কাঁটা বিঁধবে

তোমার বুকে, ফুঁড়বে তোমার হৃৎপিণ্ড, আর তোমার বুকের রক্ত বইবে আমার শিরায়, ভরবে আমার শুকনো শরীর, তোমার রক্ত হবে আমার রক্ত। ···পারবে?'

কোকিল বললে, 'একটি লাল গোলাপের জন্য আমাকে মরতে হবে! এ যে বড়ো বেশি দাম! বেঁচে থাকতে কার না ভালো লাগে! সূর্য যখন ওঠে তার সোনার রথে, আর চাঁদ দেখা দেয় তার মুক্তোর নৌকোয়—সবুজ বনের মধ্যে ব'সে তা দেখতে কী আনন্দ! জুঁইফুলের গন্ধ মধুর, মধুর পাতার ঝোপে মুখ-লুকিয়ে-থাকা নীল অপরাজিতা—আর পাহাড়ের গায়ে ঝাউয়ের ঝালর, তাও মধুর। তবু বলবো ভালোবাসার মূল্য জীবনের চেয়েও বেশি—তাছাড়া একজন মানুষের হৃদয়ের তুলনায় একটা পাখির হৃৎপিণ্ড অতি তা সামান্য।'

এই ব'লে কোকিল তার কালো পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেলো। ছায়ার মতো বনভূমি পার হ'লো, ছায়ার মতো ভেসে গেলো বন-বীথিকার উপর দিয়ে।

তরুণ ছাত্র তখনো ঘাসে শুয়ে। তার সুন্দর চোখে অশ্রুবিন্দু তখনো শুকোয়নি।

কোকিল তার কাছে গিয়ে বললে, 'আর ভেবো না, আর কেঁদো না। আমি দেবো তোমাকে লাল গোলাপ। চাঁদের-আলোয় গান গেয়ে-গেয়ে আমি গোলাপটি তৈরি করবো, তাকে রাঙাবো আমার বুকের রক্তে। এর প্রতিদানে আমি শুধু এই চাই যে তোমার ভালোবাসা হবে সত্য। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানের আধার, কিন্তু ভালোবাসা তার চেয়েও জ্ঞানী, আর পৃথিবীর সমস্ত শক্তি তার কাছে হার মানে, এতই তার জোর। তার পাখা দুটি আগুনে-রঙের, আর আগুনের মতো রঙিন তার শরীর।

মধু-র মতো মধুর তার ঠোঁট, তার নিশ্বাসের সৌরভ ধূপের ধোঁয়ার মতো।' যুবক ঘাস থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে পাখির কথা শুনলো, কিন্তু তার একটি বর্ণও সে বুঝতে পারলে না, কারণ যে-সব কথা বইতে লেখা থাকে তার বাইরে সবই তার অজানা।

কিন্তু বটগাছ বুঝতে পারলে কোকিলের কথা, মন তার খারাপ হ'য়ে গেলো। এই কোকিল যে বাসা বেঁধেছিলো তারই ডালে, তাকে সে সত্যি খুব ভালোবেসেছিলো।

বটগাছ চুপি-চুপি বললে, 'তোমার শেষ গান আমাকে শুনিয়ে দাও। তুমি চ'লে গেলে আমার বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে।'

তখন কোকিল বটগাছকে গান শোনালে, তার কণ্ঠস্বর যেন রুপোলী কুঁজো থেকে জলের উপচে-পড়া।

তার গান যখন থামলো, ছাত্রটি উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে খাতা-পেন্সিল বের করলো।

বন-বীথিকার ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ছাত্রটি মনে-মনে বললে, 'ওর গলায় সুর আছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দরদ আছে কি? বলতে দুঃখ হয়, কিন্তু বলতেই হয় যে নেই। বেশির ভাগ ওস্তাদের মতো ওর শুধু ভঙ্গিই আছে, প্রাণ নেই। অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে ও জানে না। ও ওর গান নিয়েই মত্ত, আর এ-সব শিল্পকলা যে অত্যন্ত স্বার্থপর তা কে না জানে! তবু...এ-কথা মানতেই হয় যে ওর গলায় ভারি সুন্দর কয়েকটা তান আছে। কিন্তু সে-সব তানের কোনো মানে হয় না, আর তা দিয়ে পৃথিবীর কোনো উপকারের আশাও নেই। এ-কথা যখন ভাবি তখন ভারি আপসোস হয়।'

এই ব'লে ছাত্রটি তার নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে

ভাবতে লাগলো, সেই মেয়ের কথা, যাকে সে ভালোবাসে। ভাবতে-ভাবতে খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর আকাশে যখন চাঁদ উঠলো, কোকিল উড়ে গিয়ে বসলো গোলাপগাছের ডালে, বুক রাখলো তার কাঁটার উপর। বুকে কাঁটা বিঁধিয়ে সারা রাত সে গান গাইলো, আর মুক্তা-ম্লান চাঁদ গলা বাড়িয়ে শুনলো চুপ ক'রে। সমস্ত রাত সে গাইলো গান, আর কাঁটাটি তার বুকের মধ্যে আরো, আরো গভীর হ'য়ে বিঁধে যেতে লাগলো, আর একটু-একটু ক'রে তার হৃদয়রক্ত ঝ'রে পড়তে লাগলো।

প্রথমে সে গাইলো প্রেমের গান, তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে প্রেমের উন্মীলনের গান। আর গোলাপগাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে একটি অপরূপ গোলাপ ফুটে উঠলো, গানের পর গান হ'য়ে উঠলো পাপড়ির পর পাপড়ি। গোলাপটির রঙ প্রথমে হ'লো ম্লান—নদীর উপর কুয়াশার চাদরের মতো, ভোরবেলার প্রথম পদচিহ্নের মতো ম্লান। রুপোলী আয়নায় গোলাপের ছায়ার মতো, ঝর্নার জলে গোলাপের ছায়ার মতো—গোলাপগাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে যে-ফুলটি ফুটলো তা যেন অনেকটা ঐ রকম।

তখন গোলাপগাছ কোকিলকে ডেকে বললে, 'ওগো ছোট্ট কোকিল, চেপে ধরো, আরো জোরে চেপে ধরো তোমার বুক আমার কাঁটার গায়ে। নয়তো গোলাপটি রঙিন হবার আগেই হয়তো ভোর হ'য়ে যাবে।'

কোকিল আরো জোরে চেপে ধরলো তার বুক, আবো জোরে ঐ কাঁটার উপর, আরো জোরে উঠলো তার গান, উঠলো আরো জোরে আকাশে, তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে প্রেমের উন্মীলনের সেই গান।

গোলাপের পাপড়িতে হালকা একটি লালচে আভা দেখা দিলো, যে-আভা ফোটে বধূর মুখে, বর যখন প্রথম তার দিকে চোখ মেলে তাকায়। কিন্তু কাঁটাটি তখনো কোকিলের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছয়নি, তাই গোলাপটিরও মাঝখানটা তখনো শাদা। কোকিলের হৃদয়রক্ত যদি তাকে না রাঙায়, তবে গোলাপের হৃদয় লাল হবে কেমন ক'রে?

গোলাপগাছ ব'লে উঠলো, 'ওগো ছোট্ট কোকিল, আরো, আরো জোরে চেপে ধরো তোমার বুক, চেপে ধরো আমার কাঁটার উপর, নয়তো গোলাপটি টুকটুকে হ'য়ে ওঠবার আগেই হয়তো ভোর হ'য়ে যাবে।'

আরো জোরে কোকিল চেপে ধরলো তার বুক, আরো জোরে কাঁটার গায়ে, কাঁটাটি বিঁধলো তার হৃৎপিণ্ডে, তীব্র যন্ত্রণা ছুরির মতো বিঁধলো তার দেহে। তীব্র, তীব্র সে-যন্ত্রণা, আর যত তীব্র সে-যন্ত্রণা, তত উদ্দাম হ'য়ে উঠলো তার গান। মৃত্যুতে যে-প্রেমের পূর্ণতা, মৃত্যু পার হ'য়ে যে-প্রেম মৃত্যুহীন, তার গান ঝ'রে পড়লো হাওয়ায়, বেজে উঠলো আকাশে।

লাল হ'য়ে উঠলো সেই অপরূপ গোলাপ, ভোরবেলায় পুব-আকাশের গোলাপের মতো লাল। টুকটুকে লাল পাপড়ির চন্দ্রহার, প্রবালের মতো লাল তার হৃদয়।

ক্ষীণ হ'য়ে এলো কোকিলের কণ্ঠ, তার ছোটো পাখা দুটি ঝটপট ক'রে উঠলো, আবছা ছায়া নেমে এলো তার চোখে। ক্ষীণ, আরো ক্ষীণ হ'লো তার কণ্ঠ, তার মনে হ'লো কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

তারপর তার গানের শেষ উদ্দাম ফোয়ারা উছলিয়ে পড়লো। শাদা চাঁদ শুনলে সে-গান, শুনে ভোরের আহ্বান ভুলে গিয়ে

আকাশে কেবলি দেরি করতে লাগলো। লাল গোলাপটি শুনলে সে গান, শুনে আনন্দে কেঁপে উঠে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার পাপড়িগুলি মেলে ধরলো। প্রতিধ্বনি সে-গান ব'য়ে নিয়ে গেলো পাহাড়ের বেগনি রঙের গুহায়, স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো ঘুমন্ত রাখাল বালক। নদীর তলায় কেঁপে-কেঁপে উঠলো সে-গান, ভেসে চ'লে গেলো সমুদ্রের দিকে তার বাণী।

গোলাপগাছ বললে, 'ছাখো, ছাখো, কেমন সুন্দর ফুলটি ফুটেছে।' কিন্তু কোকিল কোনো জবাব দিলে না, কারণ তখন সে লম্বা ঘাসের মধ্যে ম'রে প'ড়ে আছে, তার বুকে সেই কাঁটাটি বেঁধা।

দুপুরবেলা ছাত্রটি তার জানলা খুলে বাইরে তাকালো।

'বাঃ আমার আজ কপাল খুলে গেছে দেখছি!' সে ব'লে উঠলো। 'এই তো একটি লাল গোলাপ ফুটেছে। এত সুন্দর গোলাপ আমি জীবনেও দেখিনি। এত সুন্দর যখন, নিশ্চয়ই এর খুব লম্বা একটা ল্যাটিন নাম আছে।'

এই ব'লে সে নিচু হ'য়ে ফুলটি তুলে নিলে।

তারপর সে কাপড়চোপড় প'রে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো অধ্যাপকের বাড়িতে, লাল গোলাপটি তার হাতে।

অধ্যাপকের কন্যা দরজার ধারে ব'সে উল বুনছিলো, আর তার পায়ের কাছে ঘুমুচ্ছিলো ছোট্ট একটি কুকুর।

ছাত্রটি তার কাছে গিয়ে বললে, 'তুমি না বলেছিলে তোমাকে একটি লাল গোলাপ দিতে পারলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে! এই নাও। পৃথিবীর সমস্ত লাল গোলাপের মধ্যে এটি সব চেয়ে লাল। এই ফুলটি তুমি পারবে তোমার চুলে, আর আজ রাত্রে যখন আমি তোমার সঙ্গে নাচবো তখন তোমার কানে-কানে বলবো কত তোমায় ভালোবাসি।'

কিন্তু মেয়েটি ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকালো।

'আমার কাপড়ের সঙ্গে এই ফুল ঠিক মানাবে না,' সে জবাব দিলে। 'তাছাড়া আমাদের মেজো মন্ত্রীর ভাই-পো আমাকে একটি খাঁটি মুক্তোর হার পাঠিয়েছে, আর ফুলের চাইতে মুক্তোর দাম যে বেশি তা তো সবাই জানে।'

ছাত্রটি রেগে গিয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি ভারি অকৃতজ্ঞ!' ব'লে সে ফুলটি ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাস্তার দিকে। টুপ ক'রে গোলাপটি পড়লো কাদার মধ্যে, আর একটু পরে একটা গোরুর গাড়ির চাকা তাকে মাড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেলো।

মেয়েটি ব'লে উঠলো, 'অকৃতজ্ঞ! কোন সাহসে তুমি এ-কথা বলছো। তোমার মতো বেয়াদব তো আর দেখিনি! নিজেকে তুমি ঠাউরেছো কী? তুমি কলেজের ছাত্র—এই তো? মেজো মন্ত্রীর ভাই-পোর জুতোয় যে-রকম রুপোলী বখলশ আছে, তোমার তো তাও নেই!'

এই ব'লে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেলো বাড়ির মধ্যে।

ছাত্রটি চ'লে যেতে-যেতে বললে, 'ভালোবাসা' মানে অনেকটা বোকামি—বাকিটা ন্যাকামি। ভালোবাসা দিয়ে কোনো কাজ হয় না, যেমন, ধরা যাক, লজিক দিয়ে হয়। ভালোবাসা কিছু প্রমাণ করে না, যে-রকমটি কখনো ঘটবে না ঠিক সে-সব কথাই সে রটিয়ে বেড়ায়, ঠিক সে-সব জিনিসেই বিশ্বাস জন্মায় যা সত্যি নয়। নাঃ, ভালোবাসা জিনিসটা একেবারেই কোনো কাজে লাগে না, অথচ আজকালকার দিনে কাজের লোক না-হ'তে পারলে কিছুই হয় না। চুলোয় যাক—এর পর থেকে দর্শন আর ন্যায়শাস্ত্র ছাড়া আর-কোনো কথা ভাববোই না।'

এই ব'লে সে ফিরে এলো তার ঘরে, এসেই মস্ত মোটা একটা বই নামিয়ে পড়তে শুরু ক'রে দিলে।




তারা
থেকে
মর

মস্ত পাইন-বনের ভিতর দিয়ে দু'জন গরিব কাঠুরে বাড়ির দিকে চলেছে। শীতকাল ; কনকনে ঠাণ্ডা রাত্তির। মাটির উপর, গাছের ডালে ঘন হ'য়ে বরফ পড়ছে, বরফের চাপে ছোটো-ছোটো শুকনো ডাল পথের দু'ধারে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, আর তারই ভিতর দিয়ে দু'জনে চলেছে। চলতে-চলতে গিরি-নদীর কাছে এসে তারা দেখলো, গিরি-নদী আর চলেও না, বলেও না, তুষার-রাজার চুমোয় সে একেবারে চুপ।

সেবারে এতই শীত যে বনের পশু-পাখিরও আর সহ্য হয় না। দু'পায়ের ফাঁকে ল্যাজটি গুটিয়ে নিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নেকড়ে বাঘ বললে, 'উঃ! কী বিকট শীত! গবর্মেণ্টকেও বলিহারি! এর কোনো ব্যবস্থাই করছে না!'

'কিচ্-কিচ্! কিচ্-কিচ্! কিচ্-কিচ্!' এক ঝাঁক ছোট্ট ফিঙে ব'লে উঠলো। 'বুড়ি পৃথিবী ম'রে গেছে, শাদা কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে দিলে!'

একজোড়া পায়রা, এ ওর কানে চুপি-চুপি বললে, 'পৃথিবীর বিয়ে হবে, এই তার বধূবেশ!' তাদের ছোট্ট লালচে পাগুলো বরফে একেবারে খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই ঠাণ্ডারও বেশ একটা কবিত্বময় ব্যাখ্যা না-করলে তাদের মান থাকে না।

'যত সব বাজে কথা!' নেকড়ে বাঘ খোঁৎ ক'রে উঠলো। 'আমি বলছি এ-সবই গবর্মেণ্টের গাফিলি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো তাহ'লে তোমাদের খেয়েই ফেলবো।' বনের মধ্যে নেকড়ে ভারি কাজের লোক—তার মুখে যুক্তির অভাবও কখনো হয় না।

কাঠঠোকরা হলেন জাত-দার্শনিক, তিনি বললেন, 'হেতু কি নিমিত্ত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। যা আছে, তা আছেই ; আর এখন যে ভীষণ শীত তা তো দেখাই যাচ্ছে।'

ভীষণ শীত, সত্যি। মস্ত-মস্ত গাছের ফোকরে ছোটো-ছোটো কাঠবিড়ালিরা নাকে-নাকে ঘষাঘষি ক'রে শরীর গরম রাখছে; খরগোশেরা জড়োসড়ো হয়ে গর্তের ভিতরে প'ড়ে আছে—বাইরের দিকে তাকাতেও তারা ভরসা পায় না। শুধু বড়ো-বড়ো কালপ্যাঁচাদের এই শীতটা রীতিমতো ভালো লাগছে। বরফ প'ড়ে প'ড়ে তাদের পাখার পালক একেবারে শক্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু তাতে কী? মস্ত হলদে চোখগুলো পাকাতে-পাকাতে বনের এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত তারা গম্ভীর গলায় পরস্পরকে বলছে, 'আঃ! কী আরাম! কী চমৎকার শীত! কী আরাম!'

কাঠুরে দু'জন চলেছে তো চলেইছে। হাতের আঙুলে জোরে-জোরে ফুঁ দিচ্ছে তারা, পেরেক-বসানো জুতোয় বরফের উপর কড়কড় শব্দ হচ্ছে। একবার তো তারা বরফের একটা গভীর গহ্বরের মধ্যে ডুবেই যাচ্ছিলো—বেরিয়ে যখন এলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধবধবে শাদা। আর-একবার তারা পা পিছলে প'ড়ে গেলো—সেখানে বিলের জল জ'মে বরফ হয়েছে—আঁটি খুলে গিয়ে কাটা কাঠ গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো, তারা উঠে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আবার আঁটি বেঁধে চলতে লাগলো। আর-একবার তাদের মনে হ'লো তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, ভয়ে তাদের বুক শুকিয়ে গেলো—কারণ তারা জানতো যে বরফের কোলে যারা শোয়, বরফ তাদের দয়া করে না। পথিকবন্ধু সেন্ট মার্টিনের নাম জপ করতে-করতে তারা উল্টো দিকে ফিরে খুব সাবধানে চলতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো বন থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে, দূরে—ঐ নিচের উপত্যকায়—তাদের গ্রামের আলো মিটিমিটি জ্বলছে।

বাঁচলো তারা। আর ভয় নেই! তাদের এত আনন্দ হ'লো যে তারা হা-হা ক'রে হেসে উঠলো, পৃথিবীকে মনে হ'লো রুপোর ফুল, আর চাঁদ যেন সোনার ফুলের মতো ফুটে আছে।

কিন্তু ঐ-রকম হাসবার একটু পরেই আবার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো তাদের। মনে পড়লো তারা কত গরিব। তখন একজন আর-একজনকে বললে, 'আমাদের আর ফুর্তি করবার কী আছে, বলো? বড়োলোকেরই বেঁচে থাকা সার্থক, আমাদের বেঁচে থাকা না-থাকা একই কথা। বনের মধ্যে শীতে জ'মে আমরা যদি ম'রে যেতাম, কি বাঘ-ভালুকের হাতে আমাদের প্রাণ যেতো, তাহ'লেই কি ভালো হ'তো না?'

আর-একজন বললে, 'সত্যি কথা! কেউ-কেউ কত কিছুই পায়, অনেকে আবার কিছুই পায় না। পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারায় কোনোই সুবিচার নেই, দুঃখ ছাড়া আর-কিছুরই সমান ভাগ হয় না।'

নিজেদের ভাগ্যের কথা ভেবে তারা যখন বিলাপ করছে, ঠিক এমনি সময়ে ভারি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। আকাশ থেকে খ'সে পড়লো খুব সুন্দর খুব উজ্জ্বল একটি তারা। আকাশের গা ঘেঁষে, অন্য তারাগুলোকে পাশ কাটিয়ে এই আশ্চর্য তারাটি খ'সে পড়তে লাগলো। কাঠুরেরা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলো—তাদের মনে হ'লো অল্প দূরে উইলো গাছের পিছনে সেটি পড়েছে।

'কী কাণ্ড! ওটা যে পাবে সে এক তাল সোনা পাবে নিশ্চয়ই!' বলতে-বলতে তারা ব্যগ্রভাবে ছুটতে আরম্ভ করলো।

একজন তার সঙ্গীর চাইতে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে এসে উইলো-ঝোপের ভিতরে কোনোরকমে পথ ক'রে ঢুকলো, তারপর

ঝোপটি ছাড়িয়ে এসে দেখলো—সত্যি-সত্যি শাদা বরফের উপর এক তাল সোনা প'ড়ে আছে উর্ধ্বশ্বাসে কাছে এসে নিচু হ'য়ে তার উপর হাত রেখে দেখলো—সোনার সুতোয় বোনা অনেকবার ভাঁজ-করা একটি কাপড়, সারা গায়ে তার তারা দিয়ে কাজ করা। চেঁচিয়ে তার সঙ্গীকে ডেকে সে বললে যে আকাশ থেকে ঐশ্বর্য পড়েছে তার হাতে, তারপর দু'জনে বরফের উপর ব'সে ব'সে কাপড়ের ভাঁজগুলি একে-একে খুলতে লাগলো, সোনাটা দু'জনে সমান ভাগ ক'রে নেবে, এই তাদের মনের কথা। কিন্তু হায়রে! ওর ভিতরে না আছে সোনা, না আছে রুপো, না আছে মণিমুক্তো—আছে শুধু ছোট্ট একটি ঘুমন্ত শিশু।

তখন একজন আর-একজনকে বললে: 'ভাই রে! আমাদের সব আশা চুরমার হ'লো। ধন-রত্ন কিছুই পেলাম না—এই বাচ্চাকে দিয়ে কী-বা লাভ হবে আমাদের! চলো ওকে এখানে ফেলেই আমরা চ'লে যাই—আমরা গরিব, নিজেদের ছেলে-পুলেদেরই পেট ভ'রে খাওয়াতে পারিনে—এর উপর ওকে আবার খাওয়াবো কী?'

আর-একজন জবাব দিলে: 'না, ওকে এখানে ফেলে গেলে ও নিশ্চয়ই শীতে জ'মে ম'রে যাবে—অমন পাপের কথা মুখে এনো না। আমি তোমার মতোই গরিব, ভাঁড়ারে মা-ভবানী, অথচ পুষ্যি অনেকগুলো—তবু ওকে আমি বাড়ি নিয়ে যাবো, আমার বৌ ওকে মানুষ করবে।'

ঐ কাপড়টি দিয়ে সে ভালো ক'রে শিশুটিকে জড়ালো, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তারপর সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে উৎরাইয়ের পথে নামতে লাগলো গ্রামের দিকে। তার বোকামি দেখে,

তার ভালোমানুষির বাড়াবাড়ি দেখে তার সঙ্গী তাজ্জব ব'নে গেলো।

গ্রামের ভিতরে ঢুকে সঙ্গীটি বললে, 'তুমি তো বাচ্চাকেই নিচ্ছো, ঐ কাপড়টা আমাকে দাও। যা পেয়েছি তা দু'জনে ভাগ ক'রে নেওয়াই উচিত।'

'না, এ কাপড় আমারও নয়, তোমারও নয়, এই শিশুর,' ব'লে সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাঠুরে তার নিজের বাড়িতে এসে দরজায় টোকা দিলে।

দরজা খুলে দিয়ে কাঠুরে-বৌ যখন দেখলে যে কাঠুরে নিরাপদে বাড়ি ফিরেছে, তার আনন্দ আর ধরে না। স্বামীর কাঁধ থেকে কাঠের আঁটি নামিয়ে নিলে, জুতোয় লাগা বরফের কুচি বুরুশ ক'রে সাফ ক'রে দিলে, তারপর তাকে ভিতরে আসতে বললে।

কাঠুরে বললে, 'বৌ, আজ বনের মধ্যে একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। তোমার জন্যেই সেটা নিয়ে এসেছি—তুমি তাকে যত্ন করবে তো?' ব'লে সে চৌকাঠের ধারেই দাঁড়িয়ে রইলো।

বৌ ব্যাগ্রভাবে বললে, 'কী? কী? কৈ দেখি! আমাদের সংসারের যা হাল, কত জিনিসই তো আমাদের দরকার!'

তখন কাঠুরে কাপড়টি সরিয়ে ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখালে।

বৌ ব'লে উঠলো, 'আ আমার কপাল! আমাদের নিজেদের ছেলেপিলে কি কম যে তুমি আবার এক কুড়োনো ছেলে নিয়ে এসেছো! ছেলেটা হয়তো অলুক্ষণে, কে জানে! আর ওকে আমরা খাওয়াবোই বা কী, পরাবোই বা কী!'

বৌ রাগে গজগজ করতে লাগলো!

'শোনো, ও সাধারণ ছেলে নয়, ও তারা থেকে ঝরা।' ওকে কুড়িয়ে পাবার আশ্চর্য ইতিহাস কাঠুরে বৌকে বললে।

কিন্তু তাতেও বৌ একটুও খুশি হ'লো না, কাঠুরেকে বকুনি দিতে-দিতে খুব রাগ ক'রে বললে, 'নিজের ছেলেদের খাওয়াতে পারিনে, আর-একজনের ছেলেকে খাওয়াবো কোত্থেকে! এ-সংসারে কে কার কথা ভাবে! না-খেয়ে থাকলেও এক মুঠো কেউ দেবে আমাদের!'

'ঈশ্বর আছেন, তিনি চড়ুইপাখির কথাও ভাবেন, তাদেরও খাওয়ান।'

'শীতকালে কি চড়ুই পাখিরা না-খেয়ে মরে না? এই তো এখনই শীতকাল—দেখতেও পাও না?'

কাঠুরে কোনো জবাব দিলে না, দোরগোড়া থেকে নড়লো না।

হঠাৎ বন থেকে ঠাণ্ডা হী-হী হাওয়া এসে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, কাঠুরে-বৌ কেঁপে উঠে বললে, 'দরজাটা বন্ধ করো না! ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে—আমি তো জ'মে গেলাম।'

'যে-বাড়িতে মানুষের হৃদয় পাষাণ, সে-বাড়িতে হাড়-কাঁপানো হাওয়া তো বইবেই।'

উত্তরে বৌ কিছু না-ব'লে আস্তে-আস্তে আগুনের আরো কাছে স'রে এলো।

একটু পরে সে মুখ ফিরিয়ে কাঠুরের দিকে তাকালো, আর তার চোখ জলে ভ'রে এলো। কাঠুরে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে বাচ্চাকে বৌর কোলে তুলে দিলো। কাঠুরে-বৌ তাকে চুমু খেয়ে ছোট্ট একটি বিছানায় শুইয়ে দিল—সেখানে তার নিজের সব-চেয়ে ছোটোটি ঘুমুচ্ছিলো। পরের দিন সকালে কাঠুরে সেই আশ্চর্য সোনালি কাপড়টি সিন্দুকে ভ'রে রাখলো আর কাঠুরে-বৌ দেখলো বাচ্চার গলায় একটি অ্যাম্বরের মালা ঝুলছে।

সেই মালাটিও খুলে নিয়ে সিন্ধুকে তুলে রাখলো কাঠুরে-বৌ। কাঠুরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তারা-ঝরা শিশুও বড়ো হ'তে লাগলো। এক সঙ্গে তারা খায়, শোয়, খেলা করে। আহা, কি রূপ তারা-ঝরার! প্রত্যেক বছরই সে আরো সুন্দর হচ্ছে, গাঁয়ের সব লোক তাকে দেখে হাঁ হ'য়ে যায়। তারা সব কালো-কালো, চুল তাদের খাড়া-খাড়া; আর তার গায়ের রঙ চেরা হাতির দাঁতের মতো শাদা আর কোমল, তার কোঁকড়া কোঁকড়া সোনালী চুল যেন সূর্যমুখীর রেণু। লাল ফুলের পাপড়ির মতো তার ঠোঁট, স্বচ্ছ নদীর ধারে বেগনি রঙের ফুলের মতো তার চোখ, আর তার সমস্ত দেহটি যেন একটি ফুলের বাগান।

এত রূপ তার, কিন্তু এই রূপই তার কাল হ'লো। যেমন সে দেমাকি, তেমনি স্বার্থপর, তেমনি নিষ্ঠুর। কাঠুরের ছেলেমেয়েদের সে গ্রাহ্যই করতো না, গ্রামের কোনো ছেলেমেয়েকেই করতো না— তাদের সে বলতো ছোটোলোক ছোটোঘরের সন্তান, আর সে নিজে সবচেয়ে উচ্চবংশের, তারা থেকে তার জন্ম! তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো যেন সে প্রভু, আর তারা সব ভৃত্য। গরিবদের প্রতি একটুও দয়া ছিলো না তার, কানা-খোঁড়া-ভিখিরির প্রতিও না। ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে সে তাদের গ্রামের বার ক'রে দিতো—'যা,যা, এখান থেকে যা, এখানে মরতে আসিস কেন?' এ ছাড়া কথা ছিলো না তার মুখে। ক্রমে এমন হ'লো যে চোর-জোচ্চোর ছাড়া কেউ আর দু'বার সে গাঁয়ে ভিখ্ চাইতে আসে না। সে যেন রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আছে, নিজের রূপেই মুগ্ধ; যারা দুর্বল, যারা দেখতে ভালো নয়, তাদের সে সব সময় টিটকিরি দিতো, আর ভালোবাসতো নিজেকে। গ্রীষ্মকালে যখন হাওয়া থাকতো না, সে পুরুতঠাকুরের বাগানে কুয়োর ধারে

শুয়ে-শুয়ে জলের মধ্যে নিজের মুখ দেখতো— কী আশ্চর্য সেই মুখ— নিজের রূপ দেখে নিজেই আনন্দে হেসে উঠতো সে।

কাঠুরে আর কাঠুরে-বৌ প্রায়ই তাকে ধমক দিয়ে বলতো : 'যারা নিরাশ্রয়, যারা অসহায়, তাদের সঙ্গে তুমি যেমন ব্যবহার করো আমরা তো তোমার সঙ্গে তেমন করিনি। দয়া না-পেলে যারা বাঁচে না, তাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর কেন তুমি ?'

বুড়ো পুরুতঠাকুর প্রায়ই তাকে ডেকে পাঠিয়ে জীবে দয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, 'ঐ যে মাছিটা দেখছো, ও তোমার ভাই। তার অনিষ্ট কোরো না। বনের পাখি স্বাধীন-ভাবে উড়ে বেড়ায়, নিজের সুখের জন্যে তাকে ধরবে ব'লে ফাঁদ পেতো না। টিকটিকি, ছুঁচো, গুবরে পোকা সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি— তাদের সকলেরই জায়গা আছে পৃথিবীতে। ঈশ্বরের রাজ্যে দুঃখ আনবার তোমার তো অধিকার নেই। মাঠের গোরু-ছাগলও তাঁরই জয়গান করে।'

কিন্তু তারা-ঝরা এ-সব কথা শুনেও শোনে না, ঠোঁট উল্‌টিয়ে মুখ ভার ক'রে চলে যায়। যায় সে তার সঙ্গীদের কাছে, তাদের নিয়ে দল বাঁধে, তাদের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করে। সঙ্গীরাও তাকে মেনে চলে, কারণ সে দেখতে ভালো, পা দু'খানি তার হালকা, সে নাচতে পারে, বাঁশি বাজাতে পারে, গান গাইতে পারে। যেখানেই তারা-ঝরা তাদের নিয়ে যায়, সেখানেই যায় তারা ; যা সে হুকুম করে, তা-ই তারা না-ক'রে পারে না।

যেদিন সে বাঁশের ধারালো কঞ্চি দিয়ে একটা ছুঁচোর চোখ কানা ক'রে দিলে, সেদিন তারা হী-হী ক'রে হাসলো, আর যেদিন সে কুষ্ঠরোগীর গায়ে ঢিল ছুড়লো সেদিনও তারা হেসে লুটিয়ে পড়লো। সব ব্যাপারেই সে তাদের উপর রাজত্ব করে,

তাই তাদেরও হৃদয় তারা-ঝরার মতোই পাষাণ হ'য়ে গেছে। একদিন সেই গ্রামে এলো এক গরিব ভিখারিনী। পরনের কাপড় তার ছেঁড়া, শক্ত পথে চ'লে-চ'লে তার পা ফেটে রক্ত



বেরুচ্ছে, তার অবস্থা যে অতি হীন তা আর ব'লে দিতে হয় না। ক্লান্ত হ'য়ে সে একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসলো।

তারা-ঝরা তাকে দেখে তার সঙ্গীদের ডেকে বললো, 'দ্যাখো! দ্যাখো! সবুজ পাতায় ভরা ঐ সুন্দর গাছটির তলায় কী জঘন্য একটা ভিখিরি বসেছে। ও এত কুচ্ছিত যে ওর দিকে তাকানো যায় না! এক্ষুনি ওকে তাড়িয়ে দিই, চলো।'

এই ব'লে সে কাছে এসে ভিখারিনীকে খ্যাপাতে-খ্যাপাতে তার গায়ে ঢিল ছুড়তে লাগলো। বুড়ি তার দিকে তাকিয়ে

রইলো—তার মুখ থেকে চোখ নামালো না—সে-দৃষ্টি ভয়ে বিহ্বল। কাঠুরে একটু দূরে কাঠ কাটছিলো, সে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে ছুটে কাছে এসে ছেলেকে বকুনি দিয়ে বললে, 'এত নিষ্ঠুর তুমি! তোমার হৃদয় কি পাষাণ? দয়া-মায়া ব'লে তোমার প্রাণে কি কিছু নেই? এই বুড়ি ভিখিরি কী ক্ষতি তোমার করেছে যে তুমি তার সঙ্গে এ-রকম করছো!'

তারা-ঝরা রাগে লাল হ'য়ে মাটিতে পা ঠুকে বললে, 'আমি কী করি না করি তা নিয়ে কথা বলবার তুমি কে? আমি তো তোমার ছেলে নই যে তোমার কথামতো চলবো!'

কাঠুরে জবাব দিলে, 'সত্যি বলেছো! কিন্তু বনের মধ্যে তোমাকে যখন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম তখন তোমাকে আমি দয়াই করেছিলাম।'

এ-কথা শোনামাত্র ভিখিরি বুড়ি চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে গেলো। কাঠুরে তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো, কাঠুরে-বৌ শুশ্রূষা ক'রে তার মূর্ছা ভাঙালো, তারপর তার সামনে খাবার রেখে বললে, 'একটু ভালো বোধ করছো এখন?'

বুড়ি কিন্তু জলস্পর্শ করলো না। কাঠুরেকে বললে, 'তুমি না বললে যে ঐ ছেলেকে বনে কুড়িয়ে পেয়েছিলে? ঠিক দশ বছর আগে পেয়েছিলে কি?'

কাঠুরে বললে, 'হ্যাঁ, আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে আমি ওকে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

বুড়ি ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলো, 'কী-কী চিহ্ন ছিলো তার গায়ে, বলতে পারো? তার গলায় কি অ্যাম্বরের মালা ছিলো? তার গায়ে কি জড়ানো ছিলো তারার কাজ করা সোনালী সুতোর কাপড়?'

'ঠিক তা-ই.' বললে কাঠুরে। ব'লে সে সিন্ধুক থেকে অ্যাম্বরের মালা আর সোনালী কাপড় বের ক'রে এনে বুড়িকে দেখালো। বুড়ি আনন্দে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'ও আমার ছেলে, ওকে আমি বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওকে খুঁজে-খুঁজে সমস্ত পৃথিবী আমি ঘুরেছি— ওকে ডেকে পাঠাও, একটু দেখি ওকে।'

কঠুরে আর তার বৌ দু'জনেই বাড়ির বাইরে এসে তারা-ঝরাকে ডেকে বললে, 'বাড়ির ভিতরে যাও, সেখানে তোমার মা-কে দেখতে পাবে, তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কথাটা শুনে তারা-ঝরা যত অবাক হ'লো, খুশিও হ'লো তত। লাফাতে-লাফাতে সে বাড়ির ভিতরে চ'লে গেলো, কিন্তু গিয়ে যখন দেখলো কে ব'সে আছে, বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, 'কই, আমার মা কোথায়? এখানে তো ঐ কুচ্ছিত ভিখিরি বুড়ি ছাড়া কাউকেই দেখছিনে।'

বুড়ি বললে, 'আমিই তোমার মা।'

'পাগল! পাগল!' তারা-ঝরা চ'টে উঠে বলল, 'ছেঁড়া কাপড় পরা নোংরা ভিখিরি তুমি—আমি কক্‌খনো তোমার ছেলে নই। যাও তুমি এখান থেকে—তোমার ঐ বিচ্ছিরি মুখ আর যেন আমাকে না-দেখতে হয়।'

'না না, তুই আমারই ছেলে, তুই আমারই ছেলে—তোকে আমি বনের মধ্যে জন্ম দিয়েছিলাম!' বলতে-বলতে বুড়ি হাঁটু ভেঙে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে তারা-ঝরার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে—'ডাকাতেরা তোকে চুরি ক'রে নিয়ে ওখানেই মরণের মুখে ফেলে রেখে চ'লে গিয়েছিলো—কিন্তু আমি তোকে দেখেই চিনতে পেরেছি, আর চিহ্নও সব মিলে গেছে—ঐ সোনালী কাপড় আর অ্যাম্বরের মালা! তুই আয়, আমার কাছে আয়,

তোকে খুঁজে-খুঁজে সমস্ত পৃথিবী আমি ঘুরেছি—আয় আমার কাছে, তোকে না-পেলে আমি বাঁচবো না।'

কিন্তু তারা-ঝরা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বন্ধ ক'রে দিলো তার হৃদয়ের সব দরজা—বুড়ির বুক-ভাঙা কান্না ছাড়া ঘরের মধ্যে আর-কোনো শব্দ নেই।

অনেকক্ষণ পরে তারা-ঝরা যখন কথা বললে, তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠোর শোনালো—'সত্যি যদি তুমি আমার মা হও, তাহ'লে তুমি এখানে না-এলেই ভালো করতে। কেন আমাকে এমন ক'রে লজ্জা দিলে ? আমি ভেবেছিলাম আমার মা আকাশের কোনো তারা—আর তুমি বলছো আমি একটা ভিখিরি বুড়ির ছেলে ! তুমি এখান থেকে চ'লে যাও—আর যেন তোমাকে আমি না দেখি।'

বুড়ি কেঁদে বললে, 'বাছা, যাবার আগে তোকে একবার চুমু দিয়ে যাই, কাছে আয়। তোকে ফিরে পাবার জন্য কত কষ্ট আমি করেছি !'

তারা-ঝরা বললে, 'না, তুমি দেখতে বিকট ! তোমার চুমুর চাইতে সাপের কি ব্যাঙের চুমুও ভালো।'

বুড়ি তখন উঠে দাঁড়ালো, তারপর কাঁদতে-কাঁদতে বনে চ'লে গেলো। তারা-ঝরা যখন দেখলো যে বুড়ি চ'লে গেছে তার ফুর্তি আর ধরে না। এক ছুটে সে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলো। কিন্তু সঙ্গীরা তাকে দেখে হী-হী ক'রে হেসে উঠলো।—'সে কী ! তুই যে ব্যাঙের মতো কুচ্ছিত হ'য়ে গেছিস, সাপের মতো বিচ্ছিরি ! যা, যা, এখান থেকে—আমাদের সঙ্গে তোকে আর খেলতে দেবো না।'

বাগান থেকে ওরা তাকে তাড়িয়ে দিলে।

তারা-ঝরা ভুরু কুঁচকে বললে, 'কী? কী বললে ওরা? আমি কুয়োর ধারে গিয়ে জলের দিকে তাকাবো—জল আমাকে ব'লে দেবে আমি কত সুন্দর!'

কুয়োর ধারে গিয়ে জলের দিকে তাকালো সে। তাই তো! তার মুখ ব্যাঙের মতো, তার শরীর যে সাপের মতো হ'য়ে গেছে! ঘাসের উপর লম্বা হ'য়ে প'ড়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে নিজের মনে বললে, 'আমার পাপের জন্যেই আমার এ-দশা হ'লো। আমি আমার মা-কে মা ব'লে মানিনি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—এত অহংকার, এত নিষ্ঠুরতা সইবে কেন? আমি এখন সমস্ত পৃথিবী ভ'রে আমার মা-কে খুঁজবো—তাঁকে না-পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

কাঠুরের ছোট্ট মেয়ে তার কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'তোমার রূপ না-হয় গেছেই, তাতে কী হয়েছে? আমাদের বাড়িতেই থাকো তুমি, আমি তোমাকে কক্‌খনো খ্যাপাবো না।'

তারা-ঝরা বললে, 'না, তা হ'তে পারে না। আমি আমার মা-র প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, তারই এই শাস্তি। আমি এখান থেকে চ'লে যাবো—যতক্ষণ না মা-কে খুঁজে পাই, যতক্ষণ না মা-র ক্ষমা পাই, পৃথিবী ভ'রে শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াবো।'

ছুটে সে চ'লে গেলো বনের মধ্যে, 'মা, মা' ব'লে ডাকতে লাগলো। কোনো উত্তর নেই। সারাদিন ভ'রে সে মা-কে ডাকলো, তারপর সূর্য যখন অস্ত গেলো, শুয়ে পড়লো পাতার বিছানায়। তার কাছ থেকে পশু-পাখিরা সব পালিয়ে গেলো, তার হৃদয়হীনতার কথা কেউ তো ভোলেনি। একা-একা সে প'ড়ে রইলো, শুধু তার শিয়রে ব'সে রইলো একটা মস্ত কোলাব্যাঙ, আর একটা সাপ তার পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সকালে উঠে গাছ থেকে কয়েকটা তেতো জাম পেড়ে সে খেয়ে নিলে, তারপর মস্ত বনের মধ্যে কাঁদতে-কাঁদতে আবার হাঁটতে লাগলো। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই সে তার মা-র খবর জিগগেস করে।

ছুঁচোকে সে বললে, 'তুমি তো মাটির তলায় যেতে পার—আমার মা কি সেখানে?'

ছুঁচো জবাব দিলে :'আমি কেমন ক'রে বলবো? তুমি তো আমার চোখ অন্ধ ক'রে দিয়েছো।'

ছোটো পাখিকে সে বললে, 'উঁচু-উঁচু গাছের উপর দিয়ে উড়ে-উড়ে সমস্ত পৃথিবীটা তুমি তো দেখতে পাও—বলো আমার মা-কে তুমি কি দেখেছো?'

পাখি বললে, 'তুমি খেলতে-খেলতে আমার পাখা ভেঙে দিয়েছো—কেমন ক'রে আমি উড়বো?'

ছোট্ট কাঠবিড়ালি একা-একা মস্ত গাছের মধ্যে থাকে—তাকে সে জিগগেস করলে, 'আমার মা কোথায়, বলতে পারো?'

কাঠবিড়ালি বললে, 'আমার মা-কে তুমি মেরেছো—এবার কি নিজের মা-কেও মারতে চাও?'

তারা-ঝরার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, মাথা নিচু ক'রে সে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির কাছে ক্ষমা চাইলো, তারপর সেই বুড়ি ভিখিরিকে খুঁজে-খুঁজে আবার হাঁটতে লাগলো। তিন দিনের পর সে বন পার হ'য়ে নিম্নভূমিতে নেমে এলো—ওখানে লোকালয়ের আরম্ভ।

যে-গ্রামেই সে যায়, সেখানেই ছেলেমেয়েরা তাকে দুয়ো দেয়, তার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে। কেউ তাকে আশ্রয় দেয় না, কেউ তাকে একটু শোবার জায়গা দেয় না—সকলেরই ভয়, তার চোখ লেগে

সংসার উচ্ছন্নে যাবে, শস্য নষ্ট হবে। বাড়ির চাকররাও তাকে দূর-দূর ক'রে তাড়ায়, তার প্রতি কারোরই এক ফোঁটা দয়া নেই।

তিনটি বছর সে এমনি ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু কোনোখানেই সেই বুড়ি ভিখিরির কোনো খবর পেলো না, তার মা-র কোনো খবর পেলো না। প্রায়ই মনে হ'তো, রাস্তায় মা-কে সে তার ঠিক সামনেই দেখতে পাচ্ছে, ছুটতে-ছুটতে তার পা কেটে রক্ত বেরতো কিন্তু মা-কে সে ধরতে পারতো না—আর সে রাস্তায় যাদের বাসা তারা বলতো যে তার মা-কে, কি ও রকম কাউকেই তারা কখনো ছাখেনি—তার দুঃখ নিয়ে হাসাহাসি করতো তারা।

তিনটি বছর সে পৃথিবীতে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো —সে পৃথিবীতে স্নেহ নেই, দয়া নেই, ভালোবাসা নেই—তার গৌরবের দিনে, তার গর্বের দিনে যে পৃথিবী সে বানিয়েছিলো, এ যেন ঠিক তারই মতো নিষ্ঠুর।

নদীর ধারে শক্ত দেয়ালে ঘেরা মস্ত শহর, একদিন সন্ধ্যাবেলা সে সেই শহরের সিংহদরজার কাছে এসে দাঁড়ালো! শরীর ক্লান্ত, পা অবশ, তবু সে সেই শহরে ঢুকতে গেলো। কিন্তু প্রহরীরা তাকে বাধা দিলে। তলোয়ার উঁচিয়ে কর্কশস্বরে তারা বললে, 'কী চাও তুমি? এখানে তোমার কী দরকার?'

'আমি আমার মা-কে খুঁজছি,' সে বললে। 'আমাকে দয়া করো, আমাকে যেতে দাও—আমার মা হয়তো এই শহরেই আছেন।'

ওরা তাকে টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠলো। একজন হাতের ঢাল নামিয়ে রেখে কালো দাড়ি নেড়ে বললে, 'আহা রে, তোর মা তোকে দেখে আহ্লাদে গ'লে যাবেন! যা চেহারার ছিরি! পচা

পুকুরে যে-সাপ কিলবিল করে, কাদার মধ্যে যে কোলাব্যাঙ গলা ডুবিয়ে থাকে, তাদের চেয়েও তুই কুচ্ছিত! ভাগ্ এখান থেকে! ভাগ্! এখানে তোর মা-টা কেউ থাকে না।'

আর-একজন, তার হাতে একটা হলদে নিশেন, বললে, 'কে তোর মা? কেন খুঁজছিস তুই তাকে?'

সে বললে, 'আমার মা আমার মতোই ভিখিরি। আমি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। আমাকে দয়া করো তোমরা, আমাকে যেতে দাও, মা-র ক্ষমা আমি চাই, তোমরা বাধা দিয়ো না। হয়তো মা এই শহরেই আছেন।'

কিন্তু প্রহরীরা তাকে যেতে দিলে না, বল্লম দিয়ে তাকে খোঁচা দিলে। কাঁদতে-কাঁদতে সে ফিরে এলো।

তখন প্রহরীদের ভিড় ঠেলে অন্য একজন এলো এগিয়ে। তার বর্মে পিতলের ফুল বসানো, তার টুপিতে একটা পাখাওলা সিংহ গুড়িশুড়ি মেরে ব'সে। প্রহরীদের সে জিগগেস করলে, 'কে হে লোকটা ঢোকবার জন্যে পিড়াপিড়ি করছিলো?' ওরা বললে, 'একটা ভিখিরি—ভিখিরির ছেলে। ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'আহা, তাড়ালে কেন?' সে হেসে উঠে বললে, 'ও গোলামি করতে পারতো—ওকে কারো কাছে বেচে দেয়া যাক—ওর দাম হবে এক পাত্র মিঠে মদের দাম।'

ঠিক সেই সময়ে এক অলুক্ষণে চেহারার বুড়ো সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। সে ব'লে উঠলো, 'রাজী! আমি ওকে ঐ দামে কিনবো।' কড়ি দিয়ে কিনে সে তারা-ঝরাকে হাতে ধ'রে শহরের ভিতরে নিয়ে এলো।

অনেকগুলো রাস্তা পার হ'য়ে যেখানে তারা এলো, সেখানে বেদনা গাছে ঢাকা একটা দেয়ালে ছোট্ট দরজা বসানো।

বুড়ো একটা লাল স্ফটিক-বসানো আংটি দিয়ে দরজাটা ছুঁতেই সেটা খুলে গেলো, তারপর পাঁচ ধাপ কাঁসার সিঁড়ি নেমে তারা এলো একটা বাগানে। কালো-কালো আফিম ফুলে আর পোড়া মাটির সবুজ-সবুজ হাঁড়িতে বাগানটি ভ'রে রয়েছে। বুড়ো তার পাগড়ি থেকে একটা নকশা-আঁকা রেশমি রুমাল বের ক'রে তা দিয়ে তারা-ঝরার চোখ বাঁধলে, তারপর নিজের সামনে তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চললো। তারা-ঝরার চোখ থেকে যখন রুমাল খুলে নেয়া হ'লো তখন সে দেখলো সে আছে মাটির তলায় একটা অন্ধ, বন্ধ কুঠুরিতে, শিঙের লণ্ঠনের মিটিমিটি আলো ছাড়া আর আলো সেখানে নেই।

বুড়ো তার সামনে খানিকটা বাসি পচা রুটি রেখে বললে, 'খা।' খানিকটা নোনতা-নোনতা জল রেখে আবার বললে, 'খা।' তার খাওয়া হ'য়ে গেলে বুড়ো বেরিয়ে গেলো, বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে লোহার শিকল দিলো তুলে।

লিবিয়া দেশের সবচেয়ে চতুর জাদুকর ঐ বুড়ো। নীল নদীর তীরে মৃত আত্মার কবরের ধারে যার বাসা, এমন একজনের কাছে সে তার বিদ্যে শিখেছিলো। পরের দিন সকালে তারা-ঝরার কাছে এসে কটমট ক'রে তাকিয়ে সে বললে, 'শোন—এই শহরের সিংহদ্বারের কাছে একটা বন আছে, সেখানে আছে তিন তাল সোনা। একটা শাদা সোনা, একটা হলদে সোনা, আর একটা লাল সোনা। আজ তুই শাদা সোনার তাল আমাকে এনে দিবি—যদি আনতে না পারিস তোকে একশো বেত মারবো। শিগগির যা—আমি সূর্যাস্তের সময় বাগানের দরজায় তোর জন্যে

দাঁড়িয়ে থাকবো। দেখিস—শাদা সোনাটা ঠিক আনিস কিন্তু—না হ'লে তোকে আর আস্ত রাখবো না। মনে রাখিস, তুই



আমার গোলাম—এক পাত্র মদের দাম দিয়ে তোকে আমি কিনেছি!'

এই ব'লে বুড়া সেই নকশা-আঁকা রেশমি রুমাল দিয়ে তারা-ঝরার চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে এলো আফিম ফুলের বাগান পেরিয়ে, পাঁচ-ধাপ কাঁসার সিঁড়ি বেয়ে উঠে, আংটি দিয়ে ছোট্ট দরজাটি খুলে একেবারে রাস্তায়।

তারা-ঝরা শহরের সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলো সেই বনে, যে-বনের কথা জাদুকর বলেছিলো।

বাইরে থেকে বনটি খুব সুন্দর। মনে হয় ওর ভিতরে কত পাখির গান, কত ফুলের গন্ধ। তারা-ঝরা বেশ খুশি হ'য়েই

বনের মধ্যে ঢুকলো। কিন্তু তার নিশ্বাসেই যেন বনের সমস্ত রূপসৌরভ শুকিয়ে ঝ'রে গেলো; যেদিকে সে যায়, সেদিকেই মাটিতে কর্কশ কাঁটা গজিয়ে উঠে তাকে ঘিরে ধরে, বিশ্রী বিছুটির কামড়ে, শেয়ালকাঁটার খোঁচায় তাকে পাগল ক'রে দেয়। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে শাদা সোনা খুঁজে-খুঁজে বেড়ালো, কিন্তু কোথাও পেলো না। সূর্যাস্তের সময় অঝোরে কাঁদতে-কাঁদতে সে বাড়ির দিকে মুখ ফেরালো—হায়রে, তার কপালে আজ কী আছে তা তো সে ভালোই জানে। বনের বাইরে সে যখন প্রায় এসেছে, ঝোপের পিছন থেকে হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলো। যেন যন্ত্রণার আর্তস্বর। নিজের দুঃখ ভুলে সে ছুটে গেলো সেখানে, গিয়ে দেখলো ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়েছে একটা খরগোশ।

তারা-ঝরার দয়া হ'লো। খরগোশটাকে ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আমি ক্রীতদাস, তবু তোমার মুক্তি আমার হাতেই হ'লো।'

খরগোশ বললে, 'তুমি আমাকে মুক্তি দিলে, এর কোনো প্রতিদান আমি কি তোমাকে দিতে পারি?'

তারা-ঝরা বললে, 'এক তাল শাদা সোনা খুঁজছি আমি—কোনো-খানেই খুঁজে পাচ্ছিনে। অথচ তা যদি না নিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে বেত খেয়ে মরতে হবে।'

খরগোশ বললে, 'আমার সঙ্গে এসো। আমি জানি সেই শাদা সোনা কোথায় লুকানো আছে, কেনই বা লুকোনো আছে—তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো।'

খরগোশের সঙ্গে যেতে-যেতে তারা-ঝরা দেখলে—বিরাট এক গাছের কোটরে এক তাল শাদা সোনা। ফুর্তিতে আত্মহারা হ'য়ে সে সেটা তুলে নিলো, তারপর খরগোশকে

বললে, 'যে-উপকার আমি তোমার করেছিলাম তার অনেক গুণ তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, যে-দয়া তোমাকে আমি দেখিয়েছি তার একশো গুণ ফিরে পেলাম।'

'না। তুমি আমাকে যেমন করেছিলে, আমিও তোমাকে তেমনি করেছি।' এই ব'লে খরগোশ দ্রুতপদে ছুটে চ'লে গেলো, আর তারা-ঝরা চললো শহরের দিকে।

শহরের সিংহদ্বারে একজন ব'সে ছিলো, সে কুষ্ঠরোগী। ছাই-রঙের কাপড়ে ঢাকা তার মুখ, তার ফাঁক দিয়ে দুটো চোখ লাল কয়লার মতো জ্বলছে। তারা-ঝরাকে আসতে দেখে সে তার কাঠের বাটিতে খটখট শব্দ ক'রে ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে বললে, 'দয়া ক'রে কিছু ভিক্ষে দাও, বাবা, না-দিলে আমি না-খেয়ে মরবো। আমাকে ওরা শহর থেকে বের ক'রে দিয়েছে—আমার 'পরে কারোরই দয়া নেই।'

তারা-ঝরা বললে, 'হা ঈশ্বর, আমার কাছে তো কিছুই নেই, শুধু এক তাল সোনা আছে। আমি ক্রীতদাস, ঐ সোনা যদি নিয়ে যেতে না পারি তাহ'লে আমাকে বেত খেয়ে মরতে হবে।'

কিন্তু কুষ্ঠরোগী কেবল কেঁদে-কেঁদে অনুনয় করতে লাগলো। তারা-ঝরার দয়া হ'লো, শাদা সোনার তাল সে তাকে দিয়ে দিলে। জাদুকরের বাড়িতে সে যখন ফিরে এলো, জাদুকর দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভিতরে এনে জিগগেস করলে, 'এনেছিস শাদা সোনার তাল ?'

তারা-ঝরা জবাব দিলে, 'না, আনতে পারিনি।'

জাদুকর মেরে-মেরে তার গায়ের চামড়া তুলে দিলে, তারপর তার সামনে একটা খালি থালা রেখে বললে, 'খা।' একটা খালি গেলাশ রেখে বললে, 'এই নে জল।'

পরের দিন সকালে জাদুকর এসে বললে, 'ছাখ, আজ যদি হলদে সোনার তাল এনে না দিস, তা'হলে তোকে তিনশো বেত মারবো আর সারা জীবন তুই আমার গোলামি করবি।'

তারা-ঝরা আবার গেলো বনের মধ্যে, সারা দিন ধ'রে হলদে সোনার তাল খুঁজলো, কিন্তু কোনোখানেই পেলো না। সূর্যাস্তের সময় সে ব'সে-ব'সে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় তার কাছে এসে দাঁড়ালো সেই ছোট্ট খরগোশ, যাকে সে ব্যাধের ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছিলো।

খরগোশ বললে, 'কেন কাঁদছো তুমি? আর এই বনে খুঁজছোই বা কী?'

তারা-ঝরা বললে, 'এখানে এক তাল হলদে সোনা লুকোনো আছে—সেটা যদি আমি খুঁজে বের ক'রে নিয়ে যেতে না পারি তা'হলে এখন মরতে হবে মার খেয়ে আর সারা জীবন করতে হবে গোলামি।'

খরগোশ বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।' বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে খরগোশ তাকে একটা জায়গায় নিয়ে এলো, সেখানে খানিকটা ঝর্নার জল জ'মে আছে। সেই জলের তলায় হলদে সোনা পাওয়া গেলো।

তারা-ঝরা বললে, 'কী ক'রে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো জানিনে। এই নিয়ে দু'বার তুমি আমাকে বাঁচালে।'

'তুমিই তো আমাকে আগে দয়া করেছিলে,' ব'লে খরগোশ তাড়াতাড়ি ছুটে চ'লে গেলো।

তারা-ঝরা তার ঝুলির মধ্যে হলদে সোনার তালটা ভ'রে নিয়ে শহরের দিকে যেতে লাগলো। তাকে আসতে দেখে কুষ্ঠরোগী ছুটে এসে বললে, 'আমাকে কিছু দাও বাবা নইলে আমি আর বাঁচিনে।'

তারা-ঝরা বললে, 'আমার ঝুলিতে মাত্র এক তাল হলদে সোনা আছে—এ যদি আমি নিয়ে না যেতে পারি তা'হলে আমাকে মার খেয়ে মরতে হবে আর সারা জীবন ভ'রে গোলামি করতে হবে।' কিন্তু কুষ্ঠরোগী কেঁদে-কেঁদে এমন ক'রে বলতে লাগলো যে তারা-ঝরার দয়া হ'লো—হলদে সোনার তাল সে তাকে দিয়ে দিলে।

জাদুকরের বাড়িতে সে যখন এলো, জাদুকর দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এসে বললে, 'কোথায় আমার হলদে সোনা? এনেছিস?' তারা-ঝরা জবাব দিলে, 'না আনিনি।' জাদুকর মারতে-মারতে তার রক্ত বের ক'রে দিলে, তারপর তার হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে বন্ধ কুঠুরির মধ্যে তাকে ছুঁড়ে ফেললো।

পরের দিন সকালে জাদুকর এসে বললো, 'আজ যদি আমাকে লাল সোনা এনে দিস তাহ'লে তোকে ছেড়ে দেবো—আর যদি না আনিস তা'হলে তোকে মেরেই ফেলবো।'

আবার গেলো তারা-ঝরা বনের মধ্যে, আবার খুঁজে-খুঁজে বেড়ালো সারা দিন, কিন্তু লাল সোনা কোনোখানেই পেলে না। সন্ধ্যাবেলা সে ব'সে ব'সে কাঁদছে এমন সময় তার কাছে এলো সেই ছোটো খরগোশ।

খরগোশ বললে, 'যে-লাল সোনা তুমি খুঁজছো তা তোমার পিছনেই ঐ গুহার মধ্যে আছে। আর কেঁদো না, মন ভালো করো।'

তারা-ঝরা ব'লে উঠলো, 'কী আমি করতে পারি তোমার জন্যে? এই নিয়ে তিন বার তুমি আমাকে রক্ষা করলে।'

'না, তুমিই আমাকে প্রথমে দয়া করেছিলে,' ব'লে খরগোশ দ্রুতবেগে ছুটে চ'লে গেলো।

তারা-ঝরা গুহার মধ্যে ঢুকে দেখলো, সবচেয়ে দূরের কোণায় লাল সোনা ঝলমল করছে। সোনা তুলে নিয়ে সে তার ঝুলির মধ্যে রাখলো, তারপর তাড়াতাড়ি যেতে লাগলো শহরের দিকে। তাকে আসতে দেখে কুষ্ঠরোগী পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললে, 'ঐ লাল সোনা আমাকে দাও, নয়তো আমি বাঁচবো না।' তারা-ঝরার আবার তার 'পরে দয়া হ'লো, লাল সোনার তাল তাকে দিয়ে বললে, 'আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজন বেশি।' তবু মন তার অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গেলো— হায়রে, আজ তার কপালে না জানি কি আছে! কিন্তু এ কী কাণ্ড! শহরের সিংহদরজার ভিতর দিয়ে সে যখন আসছে, প্রহরীরা মাথা নীচু ক'রে তাকে প্রণাম ক'রে বললে, 'কী সুন্দর আমাদের প্রভু!' তার পিছনে ভিড় জ'মে গেলো, তারা সবাই বলতে লাগলো, 'এত সুন্দর কি পৃথিবীতে আর-কেউ!' তারা-ঝরা কাঁদতে-কাঁদতে নিজের মনে বললে, 'ওরা আমাকে ঠাট্টা করছে, আমার দুঃখকে বিদ্রূপ করছে ওরা!' ভিড় ক্রমে বাড়তেই লাগলো ভিড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললো সে, আর খানিক পরে দেখলো সে একটা প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজপ্রাসাদের দরজা খুলে গেলো—মন্ত্রী, সেনাপতি পুরোহিত সবাই বেরিয়ে এলো তাকে অভ্যর্থনা করতে। তার সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে তারা বললে, 'আপনি আমাদের প্রভু, আমাদের রাজপুত্র, আপনার জন্য কতকাল আমরা অপেক্ষা করেছি।'

তারা-ঝরা বললে, 'আমি রাজপুত্র নই, অতি দরিদ্র ভিখারিনীর পুত্র আমি। কেন তোমরা বলছো যে আমি সুন্দর, আমি তো জানি আমি কত কুৎসিত!'

তখন সেই একজন, যার বর্মে পিতলের ফুল বসানো, আর যার টুপিতে পাখাওলা সিংহ হামাগুড়ি দিচ্ছে, সে তার ঢাল তুলে ধ'রে বললে, 'প্রভু, এ কী রকম কথা যে আপনি সুন্দর নন !'

তারা-ঝরা সেই ঢালের দিকে তাকিয়ে দেখলে তার মুখের ছায়া। তার মুখশ্রী আবার আগের মতো হয়েছে, ফিরে এসেছে তার সমস্ত রূপ—আর নিজের চোখে সে এমন কিছু দেখলো যা আগে কখনো ছাখেনি।

পাত্র মিত্র অমাত্য সবাই তখন নতজানু হ'য়ে বললে, 'অনেক আগে দৈববাণী হয়েছিলো যে আজকের দিনে তিনি আসবেন আমাদের কাছে, যিনি আমাদের রাজা, আমাদের প্রভু। এই নিন আপনার মুকুট, এই আপনার রাজদণ্ড; ন্যায়ধর্মে, দয়া-ধর্মে আমাদের উপর রাজত্ব করুন।'

তারা-ঝরা বললে, 'আমি অতি অযোগ্য, কেননা যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, আমার সেই মা-কে আমি গ্রহণ করিনি। যতদিন না মা-কে আমি পাই, যতদিন না মা-র ক্ষমা আমাকে ধন্য করে, ততদিন আমার শান্তি নেই। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, আবার আমাকে পৃথিবী ভ'রে খুঁজে বেড়াতে হবে, এখানে দাঁড়াবার সময় আমার নেই।'

বলতে-বলতে সে রাস্তার দিকে তাকালো, যে-রাস্তাটি শহরের সিংহদ্বারের দিকে গেছে। রাস্তার ভিড় প্রহরীরা অতি কষ্টে সামলে রেখেছে—ভিড়ের মধ্যে সে দেখতে পেলো সেই ভিখারিনীকে, যে তার মা, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুষ্ঠরোগী, যাকে সে পথের ধারে ব'সে থাকতে দেখেছিলো।

আনন্দে তার মুখ দিয়ে চীৎকার বেরুলো, ছুটে গিয়ে সে তার মা-র

কাছে হাঁটু ভেঙে ব'সে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত পায়ে চুমু খেতে-খেতে চোখের জলে পা ভিজিয়ে দিলো। ধুলোর মধ্যে মাথা রেখে সে এমন ক'রে কাঁদতে লাগলো, যেন তার বুক ভেঙে যাবে। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'মা, আমার গৌরবের দিনে আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, আমার দুঃখের দিনে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমাকে ঘৃণা করেছি; তোমার ভালোবাসা আমাকে দাও। আমার মা-কে আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু তোমার সন্তানকে তুমি কোলে টেনে নাও।'

কিন্তু ভিখারিনী একটি কথাও বললে না।

তখন তারা-ঝরা দু'হাত বাড়িয়ে কুষ্ঠরোগীর শাদা পা দুটি জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'তিন বার আমার দয়ার ভাগ তোমাকে দিয়েছি— আমার মা-কে বলো, তিনি আমাকে কিছু বলুন।'

কিন্তু কুষ্ঠরোগী একটি কথাও বললে না।

আরো ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে বললে, 'মা, এত দুঃখ আমি আর সইতে পারিনে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আমি আবার বনে ফিরে যাই।'

তখন ভিখারিনী তার মাথায় হাত রেখে বললে, 'ওঠো।' কুষ্ঠরোগীও তার মাথায় হাত রেখে বললে, 'ওঠো।'

তারা-ঝরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকালো। কোথায় সেই ভিখারিনী! কোথায় সেই কুষ্ঠরোগী! একজন রাজা আর একজন রানী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রানী বললেন, 'এই তোমার পিতা, যাকে তুমি দয়া করেছিলে।' রাজা বললেন, 'এই তোমার মাতা, যার পা তুমি চোখের জলে ধুয়ে দিয়েছো।'

তার গলা জড়িয়ে ধ'রে তার মা-বাবা তাকে চুমু খেলেন, তারপর

তাকে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। অতি সুন্দর বসনে-ভূষণে সাজানো হ'লো তাকে, মাথায় তার মুকুট, হাতে রাজদণ্ড, নদীর ধারের সেই মহানগরীর রাজা হ'লো সে। তার করুণায়, তার সুবিচারে সকলেই মুগ্ধ। সেই বুড়ো বিশ্রী জাদুকরকে সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে, কাঠুরে আর কাঠুরে-বৌকে পাঠালে অনেক দামি-দামি উপহার, তাদের ছেলেমেয়েদের সম্মানে সৌজন্যে ঢেকে দিলে। পশু-পাখির প্রতি কোনোরকম নিষ্ঠুরতা সে হ'তে দিলে না, সকলকে শেখালো দয়া করতে, ভালোবাসতে; দরিদ্রকে দান করলে অন্নবস্ত্র; তার রাজত্বে সুখ শান্তি প্রাচুর্য আর ধরে না।

কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে সে পারলে না। এত দুঃখ কষ্ট পেয়ে, অমন তীব্র অগ্নিপরীক্ষা পার হ'য়ে তিন বছর পরেই সে মারা গেলো।

আর তারপরে আরম্ভ হ'লো খুব খারাপ এক রাজার রাজত্ব।

